সাহিত্য পরিচয়



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VIII vide Notification T. B. No. 76/8/13 dated 27.12.76.

সাহিত্য পরিচয়

তৃতীয় ভাগ

(অষ্টম শ্রেণীর জন্য)

ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী, এম. এ. পি. আর. এস., ডি. ফিল.
আশুতোষ, মোয়ার্ট ও গ্রীফিথ পদক প্রাপ্ত প্রাক্তন ইউ. জি. সি.
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা
ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ ও
রচনাদর্শ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, Place name of
Bengal ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক।

ও

ডঃ নির্মলেন্দু দাস, এম. এ. বি. টি., পি. এইচ. ডি,
প্রধান শিক্ষক আতাপুর কেনারাম হাইস্কুল, চব্বিশ পরগণা।
প্রবেশিকা বাংলা ব্যাকরণ ও রচনাদর্শ "বাংলা
সাহিত্যের মূল্যায়ন", "অশথ দেবদারু নিম"
ইত্যাদি গ্রন্থপ্রণেতা।

শংকর পুস্তকালয়
২২এ, কলেজ রো : কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী বিজয়া রায়
২২-এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

পরিমার্জিত মুদ্রণ—ডিসেম্বর, ১৯৮৪
পূণর্মুদ্রণ—জানুয়ারী ১৯৮৬

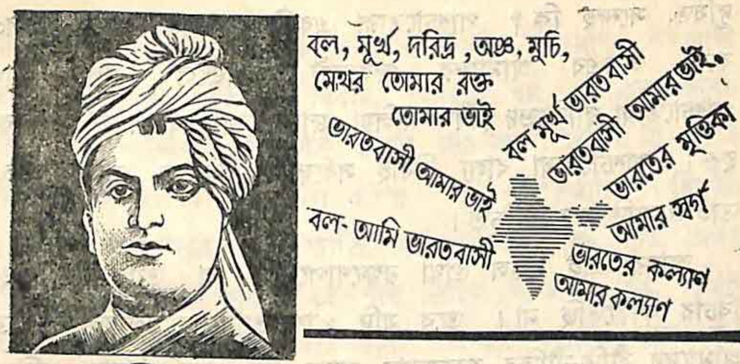
মূল্য ঃ আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুনীলকুমার ভাণ্ডারী
জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স
৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



জাতীয়তাবোধ • স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে তিনি রামকৃষ্ণদেবের সাহচর্যে আসেন। তিনি চিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম সভায় হিন্দু ধর্মের মূল সত্য প্রচার করেন। তিনি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় অনেক পুস্তক রচনা করেন। পাঠ্যাংশটি তাঁহার বর্তমান ভারত পুস্তক হইতে গৃহীত।]

বর্তমান ভারতের আর এক সমস্যা—পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ। কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে, "বুঝি কোনও ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতেই সে এত প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমন প্রবল হইতেছে যে, ভাল-মন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি-বিচার-শাস্ত্র-বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে তাহাই ভাল, তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য! ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ম্বরা হয়, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ-ভূষা, অশন-বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে, মূর্তিপূজা অতি

দূষিত, সন্দেহ কি? পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্য বিবাহ সর্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য ইহার বিচার করিতেছি না। তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞা-দৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতি-নীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তবে তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য।

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছু নাই? আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।"

যে ব্যক্তির বা যে সমাজের শিখিবার কিছু নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। শিখিবার আছে, কিন্তু ভয়ও আছে।

বর্তমানে লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। তাহাতে ইহাই ধারণা হইতেছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতসমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে। পাশ্চাত্য উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরীবিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্র-নীতি। ভারতের উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। পাশ্চাত্যের লক্ষ্য—স্বার্থপর স্বাধীনতা; আর্যসমাজে—কঠোর আত্মবলিদান।

হে ভারত,—পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী, দাস-সুলভ দুর্বলতা—এই সকল ঘৃণিত জঘণ্য, নিকৃষ্ট সম্বল লইয়া তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?

হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা,

সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়-সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। তোমার সমাজ, সে বিরাট, মহামায়ার ছায়া মাত্র ; নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—ভারতবাসী আমার ভাই ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বর্তমান ভারতের কোন্ সমস্যার কথা বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ?

২। পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আমাদের শিখিবার কি আছে ?

৩। বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে কি ভুলিতে বারণ করিয়াছেন ? এইরূপ বলিবার কারণ কি ?

৪। প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের মর্মার্থ লিখ।

৫। ভারতের নারী জাতির আদর্শ কি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি"—এই উক্তি কাহার ? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে ? এইরূপ বলিবার কারণ কি ?

(খ) "ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি ?"—নির্বুদ্ধিতা কাহাকে বলা হইয়াছে ? লেখকের এইরূপ বলিবার কারণ কি ?

(গ) পাশ্চাত্য নারী ও সমাজ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের মত লিপিবদ্ধ কর।

(ঘ) "হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা"—বিভীষিকা কাহাকে বলা হইয়াছে ?

২। টীকা লিখ :

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) যতদিন বাঁচি……শিখি।

(খ) "হে গৌরীনাথ……মানুষ কর।"

(গ) বল—ভারতবাসী আমার ভাই……ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

(ঘ) বুঝি কোনও ইংরাজ পণ্ডিত……প্রশংসা করিল।

(ঙ) হে ভারত,—পরানুবাদ……উচ্চাধিকার লাভ করিবে ?

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) বাক্য রচনা কর :

দুর্বলতা, পার্থক্য, অর্থকরী, আমরণ, ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রনীতি, আদর্শ, প্রতিবাদ, উপাস্য, শিশুশয্যা. উপবন।

(খ) পদ পরিবর্তন কর :

দরিদ্র, নীচ, প্রশংসা, মন, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, কল্যাণ, অজ্ঞ।

(গ) সন্ধি কর :

পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী, উচ্চাধিকার।

(ঘ) অর্থ লিখ :

শিশুশয্যা, কাপুরুষতা, উপাস্য, উপবন, আমরণ, অবলম্বন, কল্যাণ।

(ঙ) লিঙ্গ পরিবর্তন কর :

শঙ্কর, মুচি, মেথর, চণ্ডাল।

(চ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর :

মৃত্তিকা, প্রদত্ত।

(ছ) বিপরীত শব্দ লিখ :

দুর্বলতা, কল্যাণ, বার্ধক্য, মূর্খ, দরিদ্র।

২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

(১) মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর।

(২) ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

(৩) তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের।

(৪) আমায় মনুষ্যত্ব দাও।

(৫) আমার যৌবনের উপবন।

(খ) নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন কর ঃ

(১) তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। [যৌগিক বাক্যে পরিণত কর।]

(২) আমায় মানুষ কর। [উচিত শব্দ ব্যবহার করিয়া বাক্যটি রূপান্তরিত কর।]

(৩) পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। [জটিল বাক্যে পরিণত কর।]

(৪) ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি ? [প্রশ্ন পরিহার কর।]

(৫) মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর। [যৌগিক বাক্যে পরিণত কর।]

মৌখিক

১। (ক) 'জাতীয়তাবোধ' প্রবন্ধের লেখকের নাম কি ?

(খ) অল্পবুদ্ধি বালক রামকৃষ্ণের সম্মুখে কি করিত ? রামকৃষ্ণ তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন ?

(গ) পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহে আমাদের কি অসুবিধা হইতেছিল ?

(ঘ) 'যত্নই মানব জীবনের উদ্দেশ্য'—এইরূপ কথা বলিবার কারণ কি ?

২। (ক) শ্রীরামকৃষ্ণ কে ছিলেন ? বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল ?

(খ) 'বার্ধক্যের বারাণসী', 'যৌবনের উপবন' এই কথাগুলির অর্থ কি ?

(গ) আমাদের দেশের আদর্শ নারী কাহারা ?





ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে আগস্ট মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জুন তাঁহার পরলোক-গমন ঘটে। তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হইতেছে 'প্রকৃতি', 'যজ্ঞকথা', 'জিজ্ঞাসা', 'চরিত কথা'। বর্তমান প্রবন্ধে তিনি বিদ্যাসাগরের চরিত্র গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন।]

অনুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত, বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ যন্ত্র একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি-মাত্রায় ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। চতুষ্পার্শস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণিসমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্যায় ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভর

শক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভর শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটি কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল তাহা বিষম সমস্যার কথা। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখনও নোয়াইয়া পড়ে নাই, সেই উগ্র পুরুষকার যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল; বঙ্গদেশে তাঁহার আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়; আমাদের মত যাহারা তুলীর দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সে দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য-জাতি-সুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ, আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন। যে পুরুষাকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়দের চরিত্রে তাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের না হউক পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্র-গঠনে অনেকটা

আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই, অধিকন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ছিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে ; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে ভয়ানক দুর্গম ; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ বিদ্যাসাগর একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেইস্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশ লাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যচরিত্রে অনুকরণযোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার পূর্বেই সম্যক্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল, আর নূতন মশলা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত—যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেত্রে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্তীদের ঘৃণার উদ্রেক ভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকটজন্তু প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। বিদ্যাসাগর যদি ইংরাজী একেবারে না শিখিতেন, বা ইংরাজের সংস্রবে একেবারে না আসিতেন, চিরকালই যদি তিনি নিভৃত বীরসিংহ গ্রামের টোলখানিতে ব্যাকরণের তাৎপর্য-আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে ১৩০৪ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখের কলিকাতা

শহরের অবস্থাটি যেমন হইয়াছিল ঠিক তেমনটি না হইতে পারিত, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আপন প্রকাণ্ড পুরুষসিংহত্ব লইয়া আপনার পল্লীগ্রামখানিকে বিক্ষোভিত রাখিতেন সন্দেহ নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষদিন পর্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটি ছিলেন। পাশ্চাত্য-চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্ত তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখনও ঋণ স্বীকার করিতে হয় নাই।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বিদ্যাসাগরের যে চরিত্র মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা আলোচনা কর।

২। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সহিত বিদ্যাসাগরের চরিত্রকে তুলনা করিবার অসুবিধা কোথায়?

৩। বিদ্যাসাগর যে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন তাহা আলোচনা কর।

৪। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ গুণগুলি কি কি? বিদ্যাসাগরের চরিত্রে সত্যসত্যই কি পাশ্চাত্য জাতিসুলভ চারিত্রিক গুণ ছিল?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ"—বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রের' নাম কি? বিদ্যাসাগরের জীবন চরিতের সহিত উক্ত যন্ত্রের তুলনা করিবার কারণ কি?

২। "বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল"—কোন্ কোন্ দৃষ্টান্তের কথা বলা হইয়াছে? কাহার প্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে? এইরূপ উক্তি করিবার কারণ কি?

৩। "বিদ্যাসাগর একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন।"—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে এইরূপ উক্তি করিবার কারণ কি?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। "চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারো সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।"—কোন্ প্রবন্ধ হইতে এই অংশটি গ্রহণ করা হইয়াছে? কাহার সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে? ধবল পর্বত কি? অংশটির ব্যাখ্যা কর।

২। "বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে তাহার একান্ত অভাব।"—মেরুদণ্ড বলিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? বাঙালী চরিত্রে কোন্ জিনিষটির অভাব রহিয়াছে? অংশটি ব্যাখ্যা কর।

৩। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) এই উগ্রতা, এই কঠোরতা······পাওয়া যায়।

(খ) শুধু বাল্যজীবন কেন······করা যাইতে পারে।

(গ) তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি······তেমনি বাঙ্গালীটি ছিলেন।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ:

পুরস্কার, আনুকূল্য, মৃতপ্রায়, মলিন, কপটাচার, চতুষ্পার্শ্বস্থ, দুর্ধর্ষ, পুরুষকার।

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ:

কণ্টক, সমাবেশ, অহোরাত্র, পুরুষসিংহ, নিস্পৃহ, উচ্চচূড়া।

(গ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

কপটাচার, দুর্ধর্ষ, চতুপার্শ্বস্থ।

(ঘ) বাক্যরচনা কর:

সমাবেশ, অহোরাত্র, দুর্ধর্ষ, কপটাচার, সর্ববিধ, দুর্দমতা, অধিকন্তু, বিরল।

(ঙ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:

বিরল, নিস্পৃহ, কণ্টক, মলিন, বন্ধুর, উগ্র, উন্নত।

(চ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর:

দুর্ধর্ষ, দুর্দম, মুক্ত।

২। (ক) চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটি কঠোর কঙ্কাল বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যার কথা। সেই দুর্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখনও নোয়াইয়া পড়ে নাই, সেই উগ্র পুরুষকার যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া আপনাকে অব্যাহত রাখিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখনও ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই।

(খ) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর।

(১) **বঙ্গদেশে** তাহার আবির্ভাব……গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।

(২) **বাঙ্গালীর চরিত্রে** তাহার একান্তই অভাব।

(৩) **পরজীবনে** তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন।

মৌখিক

১। (ক) বিদ্যাসাগরের চরিত্র কোন্ জিনিষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে?

(খ) পাশ্চাত্য জাতিসুলভ গুণ কি?

(গ) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর কয়েকটি পুস্তকের নাম কর।

(ঘ) বিদ্যাসাগর যে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন তাহার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

(ঙ) বিদ্যাসাগর কেন বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত?

২। (ক) বিদ্যাসাগরের কয়েকটি রচিত পুস্তকের নাম কর।

(খ) বিদ্যাসাগরের আর কি কি গুণের কথা জান?

(গ) তিনি কি কি বিষয়ে সংস্কার করিয়াছিলেন?



দেশের শ্রীবৃদ্ধি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠাল পাড়ায়। তিনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল মৃত্যু বরণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি, এ পাশ করিবার পর ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'আনন্দমঠ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'ইন্দিরা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের সাহিত্য-সম্রাট নামে পরিচিত। বর্তমান প্রবন্ধে তিনি কৃষকদের শ্রীবৃদ্ধি না হইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না ইহাই বলিয়াছেন। বাংলাদেশ কৃষকদের লইয়া। কৃষকদের উন্নতি হইলেই বাংলাদেশের উন্নতি হইবে।]

আজি-কালি বড় গোল শোনা যায় যে, আমাদের দেশে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসন-কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি, আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহ-বর্ত্মে লৌহ তরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ একদিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণী ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ

আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রি মধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে। যে রোগ পূর্ব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসাশাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড নক্ষত্রময় আকাশে ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎস পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর, হয় কাদায় পিছলাইয়া পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যু-হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে, এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য তাহারা দাঁড়াইয়া আছে।

যে ব্যক্তি দূরবীণ সাহায্যে বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মিলে উনি এতদিন চাল-কলা ধূপ-দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি যে হতভাগ্য চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, একশত বৎসর পূর্বে হইলে আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কি না, সেই কচকচিতে মাথা ধরাইতাম তবে কি দেশের মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর!

এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে। কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থি-চর্ম-বিশিষ্ট বলদের সাহায্যে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দম পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময় সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত নুন ও লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে, তাহার পর ছেঁড়া

মাদুরে, না হয় ভূমে গোহালের একপাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহারা পরদিন প্রাতে আবার সেই এক হাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময় হয় জমিদার, নয় মহাজন পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয়ত চষিবার সময় জমিদার জমিখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে-বৎসর কি করিবে ? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে! তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদের কি মঙ্গল করিয়াছ ? আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর, তুমি যে মেজের উপর এক হাতে হংস-পক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণশ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ, তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে ?

আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল ? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল ? তোমার ও আমার মঙ্গল দেখিতেছি, তুমি আমি কি দেশ ? তুমি আমার দেশের কয়জন ? আর এই কৃষিজীবী কয়জন ? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশের কয়জন থাকে ? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী! যেখানে কৃষকদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের মঙ্গল নাই।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' কথার অর্থ কি ? বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কিরূপে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে ? কাহাদের লইয়া এই দেশ ?

২। 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' প্রবন্ধে বাংলাদেশের কৃষকদিগের যে দুরবস্থার বর্ণনা আছে তাহা লিখ। কৃষকদিগের এইরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি ?

৩। দেশের মঙ্গল বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কিরূপে হইবে ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "কি মঙ্গল দেখিতে পাইতেছ না ?"—কোন্ প্রবন্ধ হইতে এই পঙ্‌ক্তিটি গ্রহণ করা হইয়াছে ? কি কি মঙ্গলের কথা বলা হইয়াছে ?

২। "এই মঙ্গল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসার আছে।" —লেখকের জিজ্ঞাসাগুলি কি কি ?

৩। "তোমা হইতে এই হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্তের কি উপকার হইয়াছে ?"

—'তোমা হইতে' বলিতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে ? হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্ত কে ? লেখক তাহাদের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। "যেখানে কৃষকের উন্নতি নাই, সেখানে দেশের মঙ্গল নাই"—লাইনটির ব্যাখ্যা লিখ।

২। "দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল ? তোমার ও আমার মঙ্গল দেখিতেছি, তুমি আমি কি দেশ ?"—লাইনটির ব্যাখ্যা লিখ।

৩। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) ঐ দেখ, লৌহ-বর্ত্মে …এক দিকে যাইতেছে।

(খ) আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর……কি উপকার হইয়াছে ?

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ :

কর্দম, হুলুধ্বনি, ভোঁতা, উচ্চৈঃশ্রবা, ক্রীড়াশীল, কচকচি, জয়ধ্বনি, তুরঙ্গ, তুলট।

(খ) বাক্যরচনা কর :

উপবাস, অণুমাত্র, ছাতি, ভোঁতা, আরাম, উৎসন্ন, নক্ষত্রময়।

(গ) ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর :

ভ্রমরকৃষ্ণ, অগ্নিময়ী, হংস-পক্ষ, কৃষিজীবী, চশমা-নাকে-বাবু, অস্থি-চর্মবিশিষ্ট, আধপেটা, তরঙ্গমালায়, ধরাসন।

২। (ক) বিপরীত শব্দ লিখ :

ভোঁতা, আধপেটা, সভ্য, মঙ্গল, নবীন, আবাস।

(খ) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) আগে উহা **ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস** ছিল।

(২) এতকাল আমাদের **দেশ** উৎসন্ন যাইতেছিল।

(৩) আমাদের **দেশের** বড় মঙ্গল হইতেছে।

(৪) তোমার **রক্ষার জন্য** তাহারা দাঁড়াইয়া আছে।

(৫) বলদেখি **চশমা-নাকে** বাবু!

(গ) চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :

আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশে বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরাজের শাসন-কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি, আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে।

(ঘ) সমার্থক শব্দ লিখ : তরণী, আকাশ, সৃষ্টি।

(ঙ) কোন্‌টি কোন্ বাক্য বল এবং নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন কর :

(১) দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল ?

(২) বল দেখি চশমা-নাকে-বাবু !

(৩) যেখানে কৃষকের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের মঙ্গল নাই। (অস্ত্যর্থক বাক্যে পরিবর্তিত কর)

(৪) তোমার রক্ষার জন্য তাঁহারা দাঁড়াইয়া আছে। (জটিল বাক্যে পরিণত কর)

(৫) আজি কালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশে বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। (সরল বাক্যে পরিণত কর)

মৌখিক

১। (ক) দেশের শ্রীবৃদ্ধি প্রবন্ধটির লেখক কে এবং তাঁহার কোন্ গ্রন্থ হইতে প্রবন্ধটি সংগৃহীত হইয়াছে ?

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাম কর।

(গ) লৌহবর্ত্ম, লৌহ তুরঙ্গ, উচ্চৈঃশ্রবা শব্দগুলির অর্থ বল।

(ঘ) দিগ্‌গজ কি ? কাহিনীটি বল।

২। (ক) 'বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল।'—কিভাবে সম্ভব হয় ?

(খ) "এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে।"—গ্যাস কি ? বাক্যটি বুঝাইয়া দাও।

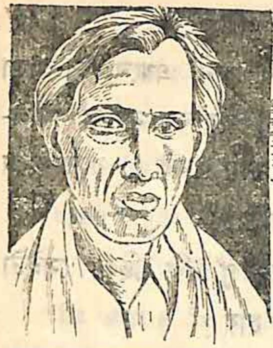
(গ) "ফুলিস্কেপ কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম।" —'ফুলিস্কেপ', 'বঙ্গদর্শন' ও 'সমাজতত্ত্ব' সম্বন্ধে যাহা জান বল।

(ঘ) "তুমি যে মেজের উপর এক হাতে হংস-পক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ।"—হংস পক্ষ কি ?

৩। (ক) 'বৃহস্পতি' কি ? এ সম্বন্ধে কি জান বল।

(খ) বাংলাদেশের কৃষকেরা কিভাবে জীবন যাপন করে ?

(গ) বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কাহাদের লইয়া দেশ ?





মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর এবং তাঁহার পরলোক গমন ঘটে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী। তিনি বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী। তাঁহার গল্প-উপন্যাস-নাটক বাঙালীর পরম আদরের সামগ্রী। তাঁহার পল্লীসমাজ, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, দেবদাস, নিষ্কৃতি প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'মহেশ' তাঁহার লেখা একটি গল্প। এই গল্পে মহেশ নামক একটি গরুকে কেন্দ্র করিয়া একটি দরিদ্র চাষীর অন্তরের গভীর বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।]

পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি। একটা পিটালী গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, "ওরে ও গফরা, বলি, ঘরে আছিস্ ?"

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙ্গা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাবলা গাছ, তাহার ডালে বাঁধা একটি ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, "হিন্দুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, খেয়াল আছে ? সকালে যাবার সময় দেখে গেছি, বাঁধা, দুপুরে ফেরার পথে দেখছি তেমনি ঠায় বাঁধা। গো-হত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।"

—"কি করবো বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পরে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধরে যে দুমুঠো খাইয়ে আনব—তা মাথা ঘুরে পড়ে যাই।"

"তবে ছেড়ে দে না, আপনি চড়াই করে আসুক।"

"কোথায় ছাড়বো, বাবাঠাকুর? লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয়নি—খামারে পড়ে, খড় এখনো পালি দেওয়া হয়নি; মাঠের আল-গুলো সব জ্বলে গেল—কোথাও একমুঠো ঘাস নেই। কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যামনে ছাড়ি?"

বামুন ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজাচালের পুঁটলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, "গন্ধ পেয়েছে, একমুঠো খেতে চায়?"

"খেতে চায়? তা' বটে!" যেমন চাষা, তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না চাল-কলা খাওয়া চাই। নে নে পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ।" এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সে দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল,—

"মহেশ তুই আমাদের, ছেলে, তুই আমাদের আট সন পিতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে ক্ষেতে দিতে পারি নে,—কিন্তু তুই ত জানিস তোকে আমি কত ভালোবাসি।"

গফুর একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরানো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া আস্তে আস্তে কহিল,—

"নে শীগগির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হলে আবার—" "বাবা ভাত খাবে এসো"—এই বলিয়া আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "মহেশকে, আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েছ, বাবা!"

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটি মাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গেছে। এমন ধারা করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না। এ কথা তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে? অথচ, এ উপায়েই বা কটা দিন চলে?

মেয়ে কহিল, "হাত ধুয়ে ভাত খাবে এস, বাবা!"

একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। এদিকে চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল,—

"আমিনা, আমার গায়ে যে শীত করে মা, জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল?"

"এক কাজ কর না মা, মহেশকে না হয় ধরে দিয়ে আয়। তখন রাতের বেলা আমাকে একমুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবিনে আমিনা?"

প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপর মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "পারবো।"

গফুরের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা আরও একজন বোধকরি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

গফুর কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায় পিপাসায় ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল; প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, "আমিনা ভাত হয়েছে রে?"

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, "কি বললি—হয়নি? কেন শুনি।"

"চাল নেই বাবা।"

"চাল নেই সকালে বলিস নি কেন?"

"তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।"

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, "রাত্তিরে যে বলেছিলুম? রাত্তিরে বললে কারো মনে থাকে?" "দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেল! বল তাও নেই!"

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নাই, তখন সে

আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুত পদে গিয়া ঠাস্ করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, "মুখপোড়া মেয়ে সারাদিন তুই করিস্ কি! এত লোক মরে তুই মরিস্ নে।"

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসটি তুলিয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সে-ই জানে। গ্রামে যে দুই তিনটি পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণ বাবুর খিড়কীর পুকুরে যে জল আছে তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কড়াকড়ি তেমনি ভিড় বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা তো কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়-বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তা পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "গফুর ঘরে আছিস?"

গফুর তিক্ত কণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, "আছি। কেন?"

"বাবুমশায় ডাকছেন, আয়।"

গফুর কহিল, "আমার খাওয়া-দাওয়া হয়নি, পরে যাব।"

এত বড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কহিল, "বাবুর হুকুম, জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।"

ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখমুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। সে জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে। পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোট মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত

মুখ বুঝিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া আসিয়া দেখিল আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপর সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল।"

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, "আমিনা চল—"

গফুর কহিল, "দেরী করিস্ নে মা চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে।"

আমিনা জল খাইবার ঘটি ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল—"ওসব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামের আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে, তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস

তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।" (সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। গল্পটি সংক্ষেপে তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। 'মহেশ' কাহার নাম? তর্করত্ন মহাশয় গফুরকে মহেশ সম্পর্কে কি বলিয়াছেন?

৩। গফুরের হাতে মহেশের মৃত্যু ঘটিল কেন?

৪। আমিনা জল সংগ্রহ করিতে পারিত না কেন? আমিনা গফুরের কে ছিল?

৫। মহেশের মৃত্যুর পর গফুর কোথায় গেল? পিতলের থালা ও ঘটি গফুর বাড়ীতে ফেলিয়া গেল কেন? মহেশের মৃত্যুর জন্য কাহারা দায়ী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "নে শীগ্‌গির করে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হলে আবার"—এই উক্তি কাহার? কাহাকে কি খাইতে বলা হইয়াছে। দেরী হইলে কি হইবে?

২। "খেতে চায়? তা বটে, যেমন চাষা তার তেমনি বলদ।"—এই উক্তি কাহার? কে, কি খাইতে চাহিয়াছিল? সে খাইতে পাইয়াছিল কি?

৩। "দেরী করিস নে মা চল, অনেক পথ হাঁটতে হবে।"—কে, কাহার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিয়াছিল? কোথায় হাঁটিয়া যাওয়ায় কথা বলা হইয়াছে? কোন্ ঘটনার পর বক্তা এই উক্তি করিয়াছিল?

৪। "মুখপোড়া মেয়ে সারাদিন তুই করিস কি? এত লোক মরে তুই মরিস নে!" বক্তা কে? কাহার উদ্দেশ্যে কেন এই কথাগুলি বলা হইয়াছিল?

৫। "বাবুর হুকুম, জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।" বাবু কে? এই উক্তি কাহার? কোন্ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বক্তা এমন উক্তি করিয়াছিল? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ভাগ্যে কি শাস্তি জুটিয়াছিল?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা কর :

(ক) আল্লা ! আমাকে যত……করো না।

(খ) পিতা ও কন্যার মাঝখানে……লক্ষ্য করিলেন।

(গ) "ওসব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"

'প্রাচিত্তির' কথার অর্থ কি ? লাইনটির ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "মহেশ তুই আমার ছেলে……কত ভালবাসি।"

(ঙ) "দে একঘটি জল দে……বল তাও নেই ?"

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ :

কাহণ, ফুটিফাটা, লাচার, বকেয়া, শাকান্ন, কুলুপ, কসুর, খিড়কী।

(খ) বাক্য রচনা কর : তেষ্টা, আত্মীয়, অনাহারক্লিষ্ট, দিগ্‌বিদিক, জ্ঞানশূন্য, লাঞ্ছনা, আত্মসংবরণ।

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্ শ্রেণীর শব্দ বল :

পিয়াদা, কসুর, শেল, আল্লা, খিড়কী, লাচার, সানকি।

(ঘ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : বিবর্ণ, জ্যান্ত, শুষ্ক, সঞ্চিত, শীর্ণ।

(ঙ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : শাকান্ন, অনাহারক্লিষ্ট, জ্ঞানশূন্য, যমদূত, তর্করত্ন, ফলমূল, ভিজাচাল, উচ্চকণ্ঠে।

(চ) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) **পথের ধারে** গফুর জোলার বাড়ি। (১) তোকে আমি **পেট পুরে** খেতে দিতে পারি নে। (৩) হাত ধুয়ে **ভাত** খাবে এসো। (৪) অনেক পথ **হাঁটতে** হবে। (৫) মহেশ আমার **তেষ্টা** নিয়ে মরেছে।

(ছ) উক্তি পরিবর্তন কর :

(গফুর) প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, "আমিনা ভাত হয়েছে রে ?"

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, "কি বললি—হয় নি ! কেন শুনি ?"

"চাল নেই বাবা ?'

"চাল নেই সকালে বলিসনি কেন ?"

"তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম ?"

(জ) পদ পরিবর্তন কর :

জল, প্রচণ্ড, সঞ্চিত, স্পর্ধা, লাঞ্ছনা বিক্ষিপ্ত, গ্রহণ।

(ঝ) নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যে রূপান্তরিত কর :

(১) তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। [যৌগিক বাক্যে পরিণত কর।]

(২) এই সমস্তই সে জানে। ['না' সূচক বাক্যে পরিণত কর।]

(৩) শিবচরণবাবুর খিড়কীর পুকুরে যে জল আছে তাহা সাধারণে পায় না। ['না' পরিহার কর।]

(৪) "সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল।" [সরল বাক্যে পরিণত কর।]

(৫) "তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।" [প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত কর।]

২। শব্দগুলির ব্যবহারের তাৎপর্য দেখাও :

নে নে, চুপি চুপি, আস্তে আস্তে, মারতে মারতে, হন হন।

মৌখিক

১। (ক) গল্পটির লেখক কে? লেখকের আরও কয়েকটি গল্পের নাম বল।

(খ) 'মহেশ' কাহার নাম?

(গ) লেখকের কোন্ কোন্ উপন্যাস তুমি পড়িয়াছ তাহার নাম বল?

(ঘ) "হিন্দুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, খেয়াল আছে?"—কে, কাকে এই কথাগুলি বলিয়াছিল? বলিবার কারণ কি?

(ঙ) "আমিনা, আমার গায়ে যে শীত করে মা, জর গায়ে থাওয়া কি ভাল?"—এই কথা বলিবার কারণ কি?

(চ) 'পিয়াদা' কাহাদের বলে? তাহাদের কাজ কি?

২। (ক) জমিদার গফুরকে শাস্তি দিয়াছিল কেন?

(খ) আমিনার আর্তকণ্ঠ প্রকাশ পাইবার কারণ কি?

(গ) "মহেশ তুই আমার ছেলে?"—মহেশকে ছেলে বলিবার কারণ কি?



বিচার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদি নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার বনগ্রাম মহকুমার বারাকপুর গ্রামে। তিনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন এবং তাহার মৃত্যু হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর। বিভূতিভূষণ বি এ পাশ করিয়া শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। তাঁহার 'পথের পাঁচালী' বিখ্যাত রচনা। ইহা ছাড়া, অপরাজিতা, দৃষ্টিপ্রদীপ, ইচ্ছামতী, মেঘমল্লার, অনুবর্তন, আরণ্যক প্রভৃতি আরও অনেক পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।]

বৃটিশ-শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথগুলি ঘোর বিপদসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙারে, জলদস্যু প্রভৃতি পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল গোয়ালা, বাগ্‌দী, বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান,—লাঠি এবং সড়কি চালনাতে নিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত। রাত্রে কালীপূজা করিয়া দূরপল্লীতে গৃহস্থবাড়ী লুট করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে কোন কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিত।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এরূপ অখ্যাতি ছিল। তাহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙারে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনারডাঙ্গার মাঠের মধ্যে ঠাকুরঝি-পুকুর নামক এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা

লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহার যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত।

গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে এই বটগাছ আজও আছে এবং সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি-পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষীদের লাঙ্গলের ফালে এই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠে।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী শ্রীপুরের পথে নিজের দেশে ফিরিতেছিলেন। সময়টা কার্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থ-সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারের চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা তুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছা রহিল যে, সম্মুখে পাঁচ ক্রোশ দূরের নবাবগঞ্জের বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ তাঁহাদের অবিদিত ছিল না; কিন্তু আন্দাজ করিতে ভুল হইয়াছিল—কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জ পৌঁছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যেই সূর্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরঝি-পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথমে ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন। ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ অপরে বালক—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়-পাল্লা দিবে। অল্পক্ষণেই তাহারা শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহার পুত্র বংশের একমাত্র সন্তান, পিণ্ডলোপ ইত্যাদি।

ঘটনাচক্রে বীরু রায়ও নাকি সেদিন দলের মধ্যে উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাহার হাতে পায়ে

পড়িয়া অন্ততঃ পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি মিনতি করেন, —কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়েদলের অনুরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত-রাতে ঠাকুরঝি-পুকুরের জলে টোপাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিল।

এই ঘটনার বেশীদিন পরে নয়, ঠিক পরবৎসর পূজার সময় বাঙলা ১২৩৮ সাল,—বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুর বাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার পাইয়া তবে আসিয়া শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম। সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়িতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া দেশের দিকে রওনা হইল। দুই দিন পরে সন্ধ্যার দিকে ধলচিতের বড় খাল ও ইছামতীর মোহনায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা লাগাইয়া রন্ধনের যোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্‌চক্ করিতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট শব্দ, একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়া তখনই থামিয়া গেল। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতেই কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুবিল। চরের সেদিকটা জনহীন—কিছুই কাহারও চোখে পড়িল না।

কী ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়ি-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিল, তাহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল, রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের উপর বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এ দেশের নোনা গাঙসমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল, কাশবনের আড়ালে বালির চরে কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়াছিল—ডাঙা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় তাহাই হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝ-নদীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল,—তাহার পর কান্নাকাটি হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গত বৎসর ঠাকুরঝি-পুকুরের মাঠে, প্রায় এই সময় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন, এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। গল্পটি তোমার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখ।

২। বিচার গল্পটিতে কাহার বিচারের কথা বলা হইয়াছে? এই বিচার কিভাবে হইল তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর?

৩। বীরু রায় কিরূপে তাহার পুত্রকে হারাইলেন?

৪। 'ঠ্যাঙাড়েরা' কথার অর্থ কি? উহাদের আড্ডা কোথায় ছিল? এই ঠ্যাঙাড়েরা কাহার অধীনে বেতনভোগী হইয়াছিল? ইহারা কি করিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) আগেকার দিনের পথঘাটের বিপদের কথা বর্ণনা কর।

(খ) 'ঠাকুরঝি পুকুর' কোথায় ছিল? সেখানে কাহাদের আড্ডা ছিল? চাষীদের লাঙলের ফলায় 'নরমুণ্ড' উঠিবার কারণ কি? বীরু রায় রায় কে ছিলেন?

(গ) বীরু রায়ের হস্তে ব্রাহ্মণ ও তার পুত্রের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল?

২। (ক) বীরু রায় সপরিবারে কোথায় যাইতেছিলেন ?

(খ) পথে তাহাদের কি বিপদ ঘটিল ? "অদৃশ্য বিচারক এ বছর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন"—এইরূপ বলিবার কারণ কি ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। (ক) "সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্ত-রাতে ঠাকুরঝি-পুকুরের জলে টোপাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিল।"—'হতভাগ্য পিতাপুত্র' বলিতে কাহাদের বুঝান হইয়াছে ? 'টোপাপানা' ও 'শ্যামাঘাস' কি ? অংশটির ব্যাখ্যা কর।

ব্যাখ্যা কর : (ক) "গত বৎসর ঠাকুরঝি……নিষ্পন্ন করিলেন"—

(খ) পুকুরের বিশেষ চিহ্ন……নরমুণ্ড উঠে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ : ঠগী, সড়কি, সড়ক, আড্ডা, নাবাল, ভরাট, অস্ফুট, পিণ্ডলোপ, নিষ্পন্ন।

(খ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর : ভয়ার্ত, নিষ্পন্ন, নিরুপায়, নির্জন, সঞ্চয়।

(গ) বাক্যরচনা কর : কাকুতি মিনতি, নিরুপায়, কৌতূহলী, আশঙ্কা, হতভাগ্য, দিগন্ত-বিস্তৃত, ঠ্যাঙাড়ে, নিরীহ।

(ঘ) সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ : দিগন্ত-বিস্তৃত, কালীপূজা, হেমন্ত রাতে, বেতনভোগী, হতভাগ্য, গৃহস্থবাড়ী, বিপদ সঙ্কুল, ঠাকুরঝি-পুকুর।

(ঙ) বিপরীত শব্দ লিখ : অদৃশ্য, নির্জন, বিলম্ব, অস্ফুট, জনহীন, আরম্ভ, শেষ, ভরাট।

(চ) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) **পুকুরধারে** প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত। (২) বৃটিশ শাসন তখন **দেশে** বদ্ধমূল হয় নাই। (৩) নোনা **গাঙের জল** চকচক্ করিতেছিল। (৪) **বাড়ীতে** পূজা হইত। (৫) **চরের** সেই দিকটা জনহীন।

২। (ক) নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন কর :

(১) পরে অবশ্য যাহা হয় তাহা হইল। [যৌগিক বাক্যে পরিবর্তিত কর]

(২) গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিল, তাহার চাকর আসিল। [সরল বাক্যে রূপান্তরিত কর]

(৩) তখনকার কালে কোন কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিত। [জটিল বাক্যে পরিণত কর]

(৪) বৃটিশ শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। ['নাই' পরিহার কর]

(৫) বিষ্ণু রাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এরূপ অখ্যাতি ছিল। ['অখ্যাতির' পরিবর্তে 'খ্যাতি' শব্দটি ব্যবহার কর।]

(খ) চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :

গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে এই বটগাছ আজও আছে এবং সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি-পুকুর বলে। ঠাকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষীদের লাঙলের ফালে এই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠে।

(গ) পদ পরিবর্তন কর : চিহ্ন, সঞ্চয়, বিশাল, বিদেশ, প্রস্তাব, ভয়ার্ত।

(ঘ) নিম্নলিখিত শব্দগুলি কি ধরণের শব্দ প্রকাশ করিয়া বাক্যে প্রয়োগ দেখাও : চক্চক্, মাঝে মাঝে, খোঁজাখুজি।

(ঙ) লিঙ্গান্তর কর : গোয়ালা, গৃহস্থ, পথিক, মাঝি।

মৌখিক

১। (ক) গল্পটির লেখকের নাম কি? তাহার বিখ্যাত উপন্যাসের নাম বল।

(খ) বীরু রায়ের বাবার নাম কি ছিল? তাহার অধীনে কাহারা থাকিত?

(গ) ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে ও জলদস্যু কাহাদের বলে? তাহাদের কাজ কি?

(ঘ) 'ডাকাতে-কালী' বলিতে কি বুঝ?

(ঙ) 'ঠাকুরঝি-পুকুরের' অবস্থান কোথায় ছিল?

২। (ক) "পথের বিপদ তাহাদের অবিদিত ছিল না।"—কোন্ বিপদের কথা বলা হইয়াছে?

(খ) "নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন—"—কি কারণে ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়াছিল? তিনি কি প্রস্তাব করিয়াছিলেন? তাহার পরিণতি কি হইল?

(গ) "যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া পড়িল।"—জলে কি পড়িয়াছিল? ইহা কোন্ ঘটনার ইঙ্গিত দিতেছে তাহা বল।

(ঘ) "গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল।"—'সকলে' বলিতে কাহাদের বুঝান হইয়াছে? কাহার সন্ধান করিয়াছিল? তাহার সন্ধান পাইয়াছিল কি? না পাইবার কারণ কি?



গঙ্গার শোভা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ) জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের জন্ম। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন না, সাহিত্যের সকল শাখাতেই তাঁহার অবদান অসামান্য। তিনি একাধারে নাট্যকার, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, সমালোচক, দার্শনিক, প্রবন্ধকার, সুগায়ক—এমন কি চিত্রকর। এশিয়া হইতে তিনিই সর্বপ্রথম নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট ২২শে শ্রাবণ তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 'গঙ্গার শোভা' নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের পাঠ-সঞ্চয় হইতে সংকলিত। ষ্টীমারযোগে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণকালে কবির রসাবিষ্টনয়নে গঙ্গার দুই তীরের দৃশ্য যেমন প্রতিভাত হইয়াছিল, এই নিবন্ধে তেমনটিই চিত্রিত হইয়াছে।]

শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা, ছায়া, কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি, গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে; একটা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে; সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে মৃদু দোলা খাইয়া, বড়ো আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার

আর-এক পাশে বড়ো বড়ো গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। এই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে ; ছেলেরা কাদার উপর পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে।

প্রাচীন ভাঙ্গা ঘাটগুলির কী শোভা! মানুষেরা যে এ-ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয় ; এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গা তীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশ্বত্থগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে —বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গাছের উপরে শেওলা পড়িয়াছে—এবং তাহার রঙ চারিদিকে শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গিয়াছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তুলি ধরিয়া এখানে-ওখানে নিজের রঙ লাগাইয়া দিয়াছেন ; অত্যন্ত কঠিন সগর্ব ধবধবে পরিপাট্য নষ্ট করিয়া ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য স্থাপন করিয়াছেন।

গ্রামের যে সকল ছেলেমেয়ে নাহিতে বা জল লইতে আসে, তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে—কেহ ইহার নাত্‌নী, কেহ ইহার মা-মাসী। তাহাদের দাদা মহাশয় ও দিদিমারা যখন একটুকু ছিল, তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে 'গেল গেল দিন' গাহিত ও গাঁয়ের দুই-চারিজন লোক আশে-পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই।

গঙ্গাতীরে ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুট-বিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

এক এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে।

কুঁড়েঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি।—কোন কোনটা বাঁকা-চোরা বেড়া দেওয়া—দুই-চারিটি গরু চরিতেছে, গ্রামের দুই-একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মতো গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে চিংড়ি-মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে।

সম্মুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীর স্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়াছে ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ী তাহার দুই-চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে।

আবার আর একদিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন। শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে, তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে যেন তরঙ্গ উঠিতে থাকে।

যে-কারণেই হউক, গঙ্গার ধারে ইটের পাঁজরগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগে;—তাহাদের আশে-পাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিকে পোড়া জায়গা এব্‌ড়ো-খেবড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুলো ইট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্বরতা ও বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মতো দাঁড়াইয়া থাকে।

গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সম্মুখে ঘাট। নহবতখানা হইতে নহবত বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট; কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল হইতে কুমড়া

ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেওয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্‌তক্ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউগাছ লতাইয়া উঠিতেছে, তার একদিকে তুলসীতলা।

সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই, সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেই হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যছবির বর্ণনা সম্ভবে না।......ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কুলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাতে ছল্‌ছল্ করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না, শোনা যায় না। কেবল ঝিঁঝিঁ-পোকার শব্দ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিবিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকারে অশ্বত্থগাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার-ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে-তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়। ওপারের বনরেখার উপর আর খানিকটা আলো পড়ে সেইটুকু আলোতে ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ওপারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। এপারে নিদ্রার রাজ্য আর ওপারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

আমাদের জাহাজ লৌহ-শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতস্বিনী খরপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনো তরঙ্গ-সংকুল, কখনো শান্ত, কোথাও সংকীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক এক জায়গায় কুল-কিনারা দেখা যায় না। আমাদের সম্মুখে পরপার মেঘের রেখার মতো দেখা যাইতেছে। চারিদিকে জেলেডিঙি ও পালতোলা নৌকা। বড় বড় জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীসৃপ জল-জন্তুর মতো ভাসিয়া

আছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে; রোদ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশবন, খেজুর বন, আমবাগান ও ঝোপ-ঝাপের ভিতরে ভিতরে এক একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙুল নানা ভঙ্গিতে আস্ফালন-পূর্বক একটি বড় ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানব-সন্তান ডাঙায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছে; যে চর্মখানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার বেশি পোশাক পরা আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। তীরের কুটীরে আলো জ্বলিল। সমস্ত দিনের জাগ্রত আলস্য সমাপ্ত করিয়া রাত্রের নিদ্রায় শরীর মন সমর্পণ করিলাম।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অবলম্বনে গঙ্গার দুই তীরের অপূর্ব শোভার যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা লিখ।

২। গঙ্গার শোভা দেখিতে হইলে কোন্ কোন্ অঞ্চলে যাইতে হইবে?

৩। গঙ্গার তীরের ঘাটগুলি ও মন্দিরগুলি সম্পর্কে কবির অভিমত কি তাহা লিখ।

৪। সূর্যাস্তের পর গঙ্গাতীরের যে অপূর্ব শোভা তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে!"—গঙ্গাতীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা কর।

(খ) "প্রাচীন ভাঙ্গা ঘাটগুলির কী শোভা!"—ঘাটগুলি সম্বন্ধে কবি যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা অল্প কথায় বর্ণনা কর।

(গ) "গঙ্গাতীরে ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে।"—গঙ্গাতীরের দেবালয়গুলি সম্বন্ধে কবির মনোভাব প্রকাশ কর।

(ঘ) "এক এক জায়গায় লোকালয়।"—লোকালয়ের বর্ণনা দাও।

(ঙ) সূর্যাস্তের পর গঙ্গার অপূর্ব শোভার যে বর্ণনা আছে তাহা মূল প্রবন্ধ অনুসরণে লিপিবদ্ধ কর।

(চ) "এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।"—শেষ বেলার দৃশ্য বর্ণনা কর।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ :—

(ক) একটা নৌকা তাহার কাছাকাছি…আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে।

(খ) মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি……মাধুর্য স্থাপন করিয়াছেন।

(গ) কিন্তু সে নিজেই……ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে।

(ঘ) সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায়……নাই বলিয়া মনে হয়।

(ঙ) ওপারের বনরেখার উপর……বলিয়া মনে হইতে থাকে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

আনন্দ, বিরাম, সমাপ্ত, প্রশস্ত, পবিত্র, দক্ষিণ, প্রাচীন, কচি।

(খ) বাক্য গঠন কর এবং বাক্যগুলি কোন্ জাতীয় তাহা লিখ :

কুলকুল, ভাঙাচোরা, আশে-পাশে, কাছাকাছি, তকতক্, চিক্‌চিক্।

(গ) পদ পরিবর্তন কর :

গ্রাম, পরিষ্কার, শ্যামল, আচ্ছন্ন, অবিরল, সমাধি, অনুর্বরতা।

(ঘ) সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :

তরঙ্গ আঘাত, লৌহ শৃঙ্খল, বনরেখা, সূর্যকিরণ, জলবদ্ধ, সৌন্দর্যছবি।

(ঙ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

সূর্যাস্ত, বৃহদাকার, দেবালয়, ঘনচ্ছায়া, উদ্ধত, ইতস্ততঃ।

২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) **নহবতখানা হইতে** নহবত বাজিতেছে। (২) একটি প্রৌঢ়া কুটীরের **দেওয়ালে** গোবর দিতেছে। (৩) ক্রমে **সন্ধ্যার আলো** মিলাইয়া যায়। (৪) এখন **বেলা** পড়িয়া আসিয়াছে। (৫) বড়ো আরামের **ঘুম ঘুমাইতেছে।**

(খ) নিম্নলিখিত অংশটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর :

সম্মুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীর স্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়াছে ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি

নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ী তাহার দুই-চারিটি হাঁড়ি-কুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে।

(গ) নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যগুলি পরিবর্তন কর :

(১) মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে ; রোদ পড়িয়া আসিতেছে। [সরল বাক্যে পরিণত কর]

(২) মানুষেরা যে এ-ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয় ; এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। [যৌগিক বাক্যে পরিণত কর]

(৩) হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। [জটিল বাক্যে পরিণত কর]

(৪) কেবল ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ ওঠে। [বাচ্য পরিবর্তন কর]

(৫) চারিদিকে জেলে ডিঙি ও পালতোলা নৌকা। ['চারিদিকের' পরিবর্তে একটি উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার কর]

(ঘ) প্রত্যয় নির্ণয় কর :
নষ্ট, আচ্ছন্ন, ভগ্ন, মাহাত্ম্য, নিস্তরঙ্গ, উদ্ধত, শ্যামল, জাগ্রত।

মৌখিক

১। (ক) 'গঙ্গার শোভা' পাঠ্যাংশটি রবীন্দ্রনাথের কোন্ পুস্তকের অন্তর্গত ?

(খ) লেখকের কয়েকটি বিখ্যাত বইএর নাম উল্লেখ কর।

(গ) লেখক গঙ্গাবক্ষের সৌন্দর্য কি ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ?

(ঘ) লেখক 'গঙ্গার শোভা' প্রত্যক্ষ করিবার সময় কোন্ কোন্ বিশেষ দ্রষ্টব্য তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল ?

(ঙ) গঙ্গার তীরের ভগ্ন দেবালয়গুলির সহিত লেখক কাহাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন ?

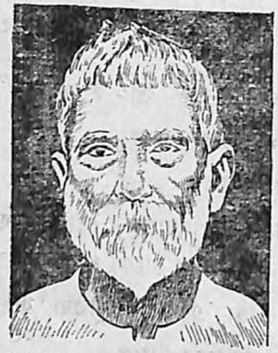
২। (ক) গঙ্গার তীরের ইটের পাঁজাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য লিপিবদ্ধ কর।

(খ) নহবতখানা কাহাকে বলে ? নহবতের কাজ কি ?

(গ) বড় বড় জাহাজগুলিকে লেখক কিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন ?

(ঘ বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের মধ্যে কে বাস করিত ?

(ঙ) 'শ্রীনিবাস' কে ছিলেন ? কোন্ প্রসঙ্গে তাহার কথা আসিয়াছে ?





জীবন-সংগ্রামে বাঙ্গালী

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

[আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী, দেশসেবক, কালকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বেঙ্গল কেমিক্যাল রসায়ন কারখানার প্রতিষ্ঠাতা। রসায়নশাস্ত্রে নতুন আবিষ্কারের জন্য ইনি বিশ্বের বিদ্বৎ-সমাজে সুপরিচিত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রাম ইহার পৈত্রিক নিবাস ও জন্মভূমি। ইহার রচিত (বঙ্গভাষায়) গ্রন্থ —'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার', 'আত্মচরিত', 'অন্ন-সমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তাহার প্রতিকার'। বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহার মত এত চিন্তা কেহই করেন নাই। বাঙ্গালীরা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে কেমন করিয়া অবাঙ্গালীদের সহিত প্রতিযোগিতায় দিন দিন পরাজিত হইতেছে এবং বাঙ্গালী যুবকেরা পরীক্ষায় পাস করাকেই জীবনের চরম ব্রত ভাবিয়া কেমন করিয়া জীবন-সংগ্রামে শোচনীয়ভাবে পরাভূত হইতেছে, লেখক এই নিবন্ধে সেই কথাই আলোচনা করিয়াছেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।]

নদীমাতৃক বাঙ্গলাদেশ চিরদিনই শস্যশ্যামল। কবি গাহিয়াছেন 'মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর', এই বর্ণনা এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে। ধনে ঐশ্বর্যে শিল্পকলায় বহুদিন হইতে বাঙ্গলার খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছিল। ঢাকার মসলিন সুদূর পশ্চিম দেশেও রপ্তানি হইত। দেশবাসীর আর্থিক সচ্ছলতা তেমন ছিল না সত্য, কিন্তু গৃহে গৃহে শান্তি বিরাজ করিত। তাহাদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পক্ষে মোটা ভাত মোটা কাপড়ই যথেষ্ট ছিল।

তারপর বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রার পথও অধিকতর দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। অভাব-অভিযোগ

আজ দৈনন্দিন জীবনের সম্বল, শত শত যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরর্থক উপাধি সম্বল করিয়া জীবন-সংগ্রামে আজ দিশাহারা। ব্যবসায়িগণ আজ তাহাদের ব্যবসা হারাইয়াছে। জমিদার, মহাজন সকলেই দুর্দশাগ্রস্ত, বলিতে গেলে বাঙ্গলাদেশ আজ শ্রীহীন ও পরদ্বারস্থ।

বিদেশী বণিকগণ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা এইখানে আসিয়া উপজীবিকা সংগ্রহ করিতেছে, আর দেশের যুবকগণ হা-অন্ন হা-অন্ন করিয়া দেশ-বিদেশে চাকরির অন্বেষণে ধাবমান। দেশের কৃষিজীবীরাও আজ আলস্যপরায়ণ হইয়া উপবাস করিতে বসিয়াছে। আগের মত তাহারা আর জমিতে ফসল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। একটু ধীর চিত্তে দেশের এই নিদারুণ অর্থনীতিক বিপর্যয়ের কথা ভাবিলে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী জাতি দিন দিন ধ্বংস হইতে গভীরতর ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। দুঃখে, দারিদ্র্যে, অর্ধাহারে, অনাহারে ও ক্ষয়রোগ প্রভৃতি ব্যাধির কবলে পড়িয়া কত দিন যে এই জাতি টিকিয়া থাকিবে, ইহাই ভাবিবার কথা। বাঙ্গালী আজ জীবন-মরণ সমস্যায় উপনীত।

বাঙ্গালীর এই দুর্দশা আত্মকৃত। অলসতা, অকর্মণ্যতা, শ্রমবিমুখতা আমাদিগকে দিন দিন একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। ৫০/৬০ বৎসর আগের কথা—তখন দেশে ধোপা, নাপিত, পাট্‌নি, মুটেমজুর সবাই বাঙ্গালী ছিল, বর্তমানে তাহাদের মুখের গ্রাস অ-বাঙ্গালীরা আসিয়া কাড়িয়া লইতেছে। এই কলিকাতা শহরে সেলাই-জুতির মধ্যে একটিও বাঙ্গালী দেখা যায় না। আমাদের দেশে মুচির অভাব নাই। তাহারা জানে শুধু পরের কাছে হাত পাতিতে। ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা, না খাইয়া মরিবে, কিন্তু কিছুতেই কাজ করিবে না। ধোপার অন্ন গিয়াছে। এই কলিকাতা মহানগরীতে কদাচিৎ দুই-একটি বাঙ্গালী ধোপা দৃষ্ট হয়। ৫০/৬০ বৎসর পূর্বের কথা, বাঙ্গালী ধোপারা এই শহরে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত, জাহাজের কাপড় ধোয়া তাহাদের একচেটিয়া ছিল, কিন্তু অধিকতর

কর্মপটু এবং শ্রমশীল পশ্চিমাদের নিকট এখন তাহারা হটিয়া যাইতেছে।

শহরের গোয়ালাদের অধিকাংশই পশ্চিমা। শুধু অ-বাঙ্গালী নয়, বিদেশীরাও এখানে আসিয়া অন্নসংস্থান করিতেছে। শহরের ছুতারের কাজ এবং জুতা-তৈয়ারীর কাজ তাহাদের প্রায় একচেটিয়া। ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে আমি দেখিতাম, এখন যেখানে কলেজ স্ট্রীট্ মার্কেট, সেইখানে খোলার ঘরে শত শত বাঙ্গালী মুচি ঠন্ঠনিয়ার চটি প্রস্তুত করিত, তাল-তলাতেও চটি তৈয়ারী হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই চটি ব্যবহার করিতেন। বাঙ্গালী মুচিরা গেল কোথায় ? শুধু বাঙ্গালী নয়, পশ্চিমা মুচিরাও আজ চীনাদের নিকট পরাস্ত। তাহারা নিজেরা চর্মসংস্কারের কারখানা খুলিতেছে। বালিগঞ্জ পাগলাডাঙ্গা অঞ্চলে চীনাদের এরূপ অনেকগুলি ছোট ছোট ট্যানারি আছে। তথাকার চামড়ায় জুতা তৈয়ারী করিয়া তাহারা প্রচুর লাভবান হইতেছে।

পুরুষের ন্যায় তাহাদের মেয়েরাও অত্যন্ত শ্রমশীল। আজ ঢাকা শহরে ১৪/১৫টি চীনা জুতার দোকান। তাহারা দ্বারে দ্বারে নতজানু হইয়া জুতার অর্ডার সংগ্রহ করিয়া থাকে, আমাদের বাঙ্গালী জুতা-ব্যবসায়ীর ন্যায় শুধু দোকান করিয়া বিজলীপাখার তলায় বসিয়া দিন কাটায় না। কি করিয়া ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয় তাহা তাহারা সবিশেষ জানে।

আর একটি জিনিসও তাহারা দখল করিয়াছে, সেটি ছুতারের কাজ। শহরে বাঙ্গালী ছুতার একপ্রকার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাহারা আবহমানকাল প্রচলিত ধারায় কাজ করিয়া আসিতেছিল, নূতন কিছু শিখিবার আগ্রহ তাহাদের ছিল না। এই অবসরে চীনারা নূতন উদ্যম ও নব নব কর্মপটুতার দ্বারা এই শিল্পের উন্নতি-সাধন করিয়াছে এবং বাঙ্গালী ছুতারদিগকে হটাইয়া দিয়াছে। জাহাজ, ট্রাম, বাস প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে হইলে তাহাদের না হইলে চলে না। ট্যাংরা অঞ্চলে চীনাদের বড় বড় কারখানা দেখা যায়।

এইবার বাঙ্গলার খেয়াঘাটগুলির কথা বলিতেছি। সর্বাপেক্ষা

আক্ষেপের বিষয় এই যে বিদেশী না হইলে আমাদের খেয়া পারাপারও চলে না। ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতির অধীনে সমস্ত খেয়াঘাটগুলি পশ্চিমারা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কারণ, তাহারা আমাদের দেশের পাটনিদের ন্যায় অলস নহে এবং তাহাদের কর্মশক্তি অনেক বেশী। একটু বিপরীত স্রোত ও বায়ুর মুখে কখনই দেশী পাটনিরা নৌকা চালাইবে না। কিন্তু পশ্চিমারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইলে সব সময়ে সকল কাজেই অগ্রসর হয়।

এইবার বাঙ্গলার ব্যবসায়ীর দিকে তাকানো যাক্। আমি একথা বহুবার বলিয়াছি যে যদি একজন বৈদেশিক হাওড়া স্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া কলিকাতায় প্রবেশ করে, তবে বড়বাজারের তু'ধারের গগন-স্পর্শী হর্ম্যমালা দেখিয়া নিশ্চয়ই বলিবে যে ইহা মাড়োয়ারী অথবা ভাটিয়ার দেশ। বাঙ্গলার প্রধান প্রধান ব্যবসা আজ অ-বাঙ্গালীর দ্বারা অধিকৃত। রেলওয়ে হইবার বহুপূর্বে ইহারা পদব্রজে এদেশে আসিয়াছে, আজ শুধু কলিকাতা শহরে নয়, বাঙ্গলার প্রধান প্রধান গঞ্জে ও বন্দরে, এমন কি নিভৃত পল্লীতে পল্লীতেও তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তথাকার বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিতেছে। ইহার কারণ কি? অন্য প্রদেশ হইতে লোক আসিয়া বাঙ্গালীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। ইহা কি আমাদের নিদারুণ অলসতা ও অকর্মণ্যতার পরিচয় দেয় না?

বাঙ্গালী এতদিন ব্যবসা করিয়াছিল প্রতিযোগিতাবিহীন হইয়া; ফলে ব্যবসার সূক্ষ্ম দৃষ্টিও তাহাদের খুব কম ছিল, তদুপরি গদিয়ান ভাবের বশে ও পয়সার গরমে তাহারা আজ সমূলে বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। ৭০/৮০ বৎসর পূর্বে হৌসের মুচ্ছুদ্দিরা সবাই বাঙ্গালী ছিল; আজ একজন বাঙ্গালীও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গত শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মতিলাল শীল, রামতুলাল সরকার প্রভৃতি বাঙ্গলার ব্যবসায়-জগতের ধুরন্ধরবৃন্দের জীবনী পাঠে তখনকার ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে বাঙ্গালীর কতদূর প্রতিষ্ঠা ছিল তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। একা মতিলাল

শীলই ৮/১০ ফার্মের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। আমদানি ও রপ্তানির জন্য তাঁহার নিজের জাহাজ ছিল।

রামদুলাল সরকার ও প্রাণকৃষ্ণ লাহাও অতি হীন অবস্থা হইতে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া বাঙ্গলার ব্যবসা-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিলেন। কথায় বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"। যেদিন বাঙ্গলা তাহার ব্যবসা হারাইয়া পরের গোলামির দিকে নজর দিয়াছে, সেইদিন হইতে বাঙ্গালীর অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। একে তো বিদেশী বণিকগণ কোটি টাকা দেশ হইতে শুষিয়া লইতেছে, তাহার উপর অ-বাঙ্গালীরা যাহা বাকি ছিল তাহাও অধিকার করিয়া লইয়াছে।

আমার 'আত্মচরিতে' স্পষ্টই দেখাইয়াছি যে, প্রতিমাসে দশ কোটি টাকা বাঙ্গলা হইতে অ-বাঙ্গালীরা লইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী গেল কোথায়? যদি জানিতাম, তাহারাও আবার অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়া আনিয়া বাঙ্গলায় ধনভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন করিতেছে, তাহা হইলে কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু বিদেশ হইতে অর্থ উপার্জন করিয়া আনা তো দূরের কথা, নিজের পৈতৃক ব্যবসা আজ বাঙ্গালী রক্ষা করিতে পারিল না। আজ যদি জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালী আবার ধীরে ধীরে অ-বাঙ্গালীদের ন্যায় তাহার সেই পূর্ব ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে জাতির ধ্বংস অতি সন্নিকট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া জীবন ধারণ চলে না, আমি একথা বহুবার বলিয়াছি এবং আজও ইহা বলিতে পশ্চাৎপদ নই। এই মিথ্যা মোহই আমাদের সর্বনাশের অন্যতম কারণ। যুবকগণ যাহারা দেশের আশা-ভরসাস্থল, যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তক্‌মা লইয়া বাহির হয় তাহাদের অধিকাংশই তখন ভগ্নস্বাস্থ্য ও অবসাদগ্রস্ত। কোনোরকমে দিন চালানোর মত একটি চাকুরি মিলিলেই তাহারা জীবন সফল মনে করে। কাজে উদ্যম থাকে না। চাকুরির জন্য দ্বারে দ্বারে ধর্‌না দিতে পারিবে, কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের দিকে মোটেই লক্ষ্য করিবে না।

এইখানে একটি কথা বলিবার আছে। বাঙ্গলাদেশে হাজার-করা মাত্র ৮ জন সরকারী চাকুরিজীবী। যাহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় বা অবসর গ্রহণ করে, তাহাদের পদ খালি হইয়া থাকে, সুতরাং হিসাব করিয়া দেখিলে জনসংখ্যার প্রতি দশ হাজারে ২/১ জনের চাকুরি হইতে পারে। এই চাকুরিয়াদের মধ্যে আরদালী, বেয়ারা, চৌকিদার, কনস্টেবল, সকলকেই ধরা হইয়াছে। কাজেই এই চাকুরিকে উপজীবিকা ধরিলে জাতি কখনই টিঁকিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইহাদিগকে শুধু অকর্মণ্যই করে নাই, একটি মিথ্যা অভিমানে ইহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ইহারা নিজেরা বাজার করিতে অপমান বোধ করে, পল্লীর হালচালের সহিত ইহাদের বিরোধ, পৈতৃক ব্যবসাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এদেশে আসিয়াছে সত্য, কিন্তু তাদৃশ সুফল ফলে নাই। কারণ দেশের তথাকথিত শিক্ষিতেরা শ্রমের মর্যাদা শিখে নাই। প্রকৃত শিক্ষা সর্বকালেই মানবজীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু চাকরির জন্যই বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে, এই ধারণা নিতান্তই অযৌক্তিক।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বাঙ্গালীর বর্তমান অন্ন-সমস্যার কারণ কি? তোমার মতে এই সমস্যার সমাধানের উপায় কি?

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এ সমস্যার কতটা সমাধান করিতে পারে?

৩। অ-বাঙ্গালীরা আমাদের কোন্ কোন্ বৃত্তি ও উপজীবিকা দখল করিয়াছে?

৪। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "বিদেশী বণিকগণ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা এইখানে আসিয়া উপজীবিকা সংগ্রহ করিতেছে।"—বিদেশী বণিকগণ

ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীরা আমাদের দেশে আসিয়া কি কি উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ কর।

(খ) "এইবার বাঙ্গলার খেয়াঘাটগুলির কথা বলিতেছি।"—খেয়াঘাটগুলি প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত কি লিখ।

(গ) বাঙ্গলার ব্যবসায়ী প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মতিলাল শীল ও রামদুলাল সরকার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(ঘ) "বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া জীবন ধারণ চলে না"—লেখকের কোন্ যুক্তির আলোকে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ?

(ঙ) বাঙ্গলাদেশের চাকুরিজীবীদের সম্বন্ধে লেখকের অভিমত প্রকাশ কর।

(চ) "বাঙ্গালীর এই দুর্দশা আত্মকৃত"—এইরূপ বলিবার কারণ কি ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) একটু ধীর চিত্তে দেশের........পথে অগ্রসর হইতেছে।

(খ) দুঃখে, দারিদ্র্যে, অর্ধাহারে........সমস্যায় উপনীত।

(গ) কথায় বলে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"......অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে।

(ঘ) চাকুরির জন্য দ্বারে দ্বারে........মোটেই লক্ষ্য করিবে না।

২। "প্রকৃত শিক্ষা সর্বকালেই মানব জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু"। কোন্ প্রসঙ্গে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে ? বাক্যটির ব্যাখ্যা কর।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

যথেষ্ট, অর্ধাহার, অন্বেষণ, দুর্দশা, সর্বোচ্চ, জীবিকার্জন, অত্যুক্তি।

(খ) লিঙ্গ পরিবর্তন কর :

গোয়ালা, বিদেশী, ধোপা, শ্রমশীল, তাদৃশ, পুরুষ।

(গ) পদান্তর কর :

খ্যাতি, অতিরঞ্জিত, প্রসিদ্ধি, সচ্ছলতা, অতিবাহিত, শান্তি, প্রচুর,

উপার্জন, প্রস্তুত, সংগ্রহ, অভিযান, প্রয়োজনীয়, অবগত, অধিকার, অপমান।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :

শস্য শ্যামল, জীবন-মরণ, শতাব্দী, চাকুরিজীবী, অবসাদগ্রস্ত, আশা-ভরসা-স্থল, দিশাহারা, সুফল।

(ঙ) বাক্যরচনা কর :

অযৌক্তিক, ভগ্নস্বাস্থ্য, অবসাদগ্রস্ত, সন্ধিক্ষণ, পৈতৃক, উপার্জন, প্রতিযোগিতা, গ্রাস, আত্মকৃত, অর্ধাহার, পরদ্বারস্থ, শ্রমশীল।

(চ) নিম্নলিখিত শব্দগুলি কোন্-শ্রেণীর তাহার উল্লেখ কর :

আরদালী, বেয়ারা, কনস্টেবল, তক্‌মা, ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ট্যানারি, পাটনী।

২। নিম্নলিখিত অংশটি **চলিত** ভাষায় রূপান্তরিত কর :

পুরুষের ন্যায় তাহাদের মেয়েরাও অত্যন্ত শ্রমশীল। আজ ঢাকা শহরে ১৪।১৫টি চীনা জুতার দোকান। তাহারা দ্বারা দ্বারে নতজানু হইয়া জুতার অর্ডার সংগ্রহ করিয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালী জুতা ব্যবসায়ীর ন্যায় শুধু দোকান করিয়া বিজলী পাখার তলায় বসিয়া দিন কাটায় না। কি করিয়া ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয় তাহা তাহারা সবিশেষ জানে।

৩। (ক) নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উদ্দেশ্য বিধেয় অংশে ভাগ করিয়া দেখাও :

(১) শুধু অ-বাঙ্গালী নয়, বিদেশীরাও এখানে আসিয়া অন্ন সংস্থান করিতেছে।

(২) দেশের কৃষিজীবীরাও আজ আলস্যপরায়ণ হইয়া উপবাস করিতে বসিয়াছে।

(৩) বাঙ্গালী আজ জীবন-মরণ সমস্যায় উপনীত।

(৪) ধোপার অন্ন গিয়াছে।

(৫) ঢাকার মস্‌লিন সুদূর পশ্চিম দেশেও রপ্তানি হইত।

(খ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর ঃ

আর্থিক, সম্বল, পরাস্ত, বিনষ্ট।

(গ) পাঠ্যাংশ হইতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

— বাঙ্গলাদেশ চিরদিনই —। কবি গাহিয়াছেন '— — ধান ধরে নাকো আর', এই বর্ণনা এতটুকু — নহে। ধনে ঐশ্বর্যে — বহুদিন হইতে বাঙ্গলার খ্যাতি সমস্ত —. — লাভ করিয়া আসিতেছিল।

মৌখিক

১। (ক) 'জীবন সংগ্রামে বাঙ্গালী' পাঠ্যাংশটি কোন্ লেখকের লেখা? লেখকের কয়েকটি গ্রন্থের নাম কর।

(খ) 'আত্মচরিত' কাহার লেখা?

(গ) বাঙ্গালীর দুর্দশা 'আত্মকৃত' হইবার কারণ কি?

(ঘ) আমাদের দেশের অধিকাংশ গোয়ালা এবং জুতা ব্যবসায়ীরা কোথাকার লোক?

(ঙ) 'মুচ্ছুদ্দি' কথার অর্থ কি?

২। (ক) প্রাণকৃষ্ণ লাহা, মতিলাল শীল ও রামদুলাল সরকার সম্বন্ধে কি জান বল।

(খ) "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" কথার অর্থ কি?

(গ) "বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লইয়া জীবন ধারণ চলে না"—এই কথা বলিবার কারণ কি?

(ঘ) 'মসলিন' বলিতে কি বুঝ? উহা কোথায় পাওয়া যাইত?





রেশম

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর এবং মৃত্যু ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর। তাঁহার জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটিতে। ইনি কঠিন বিষয়কে খুব সরল করিয়া বহু পুস্তক ও বাংলা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বহু প্রাচীন পুঁথিও ইনি আবিষ্কার করিয়াছেন। "হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধগান ও দোঁহা" তাঁহারই আবিষ্কার। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলার অতীত গৌরব রেশম শিল্পের কথা তিনি অতি সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।]

বাংলার অন্যতম গৌরব রেশমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীন দেশ হইতে রেশমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাহারা রেশমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাহাদের সংস্কার, চীনই রেশমের জন্মস্থান ; চীনারাও তাহাই বলে। তাহারা বলে খ্রীষ্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্বে চীনের রানী তুঁত গাছের চাষ আরম্ভ করেন। রেশমের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশে অনেক লেখা আছে। চীনারা রেশমের চাষ কাহাকেও শিখিতে দিত না। এটি তাহাদের উপনিষৎ বা গুপ্ত বিদ্যা ছিল। জাপানীরা অনেক কষ্টে খ্রীষ্টের তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেশমের চাষ শিক্ষা করে। ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাষ আরম্ভ করেন। ইউরোপে খ্রীষ্টের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থলপথে চীনের সহিত রেশমের ব্যবসা চলিত, অনেকে মনে করেন, এই রেশমের ব্যবসার জন্যই পাঞ্জাবের শক রাজারা বেশী করিয়া সোনার টাকা চালান। ইউরোপে রেশমের চাষ ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাংলা দেশে খ্রীষ্টের তিন-চারি শত বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব হইত। রেশমের খুব ভাল কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণা' অর্থাৎ পাতার রেশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে রেশম বাহির করে সেই রেশমের কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণা'। সেই পত্রোর্ণা তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্রদেশে ও সুবর্ণকুড্যে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল আর বট গাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হলদে রঙের রেশম হইত, লিকুচের পোকা হইতে যে রেশম বাহির হইত তাহার রঙ গমের মত, বকুলের রেশমের রঙ সাদা, আর বট গাছের রেশমের রঙ ননীর মত। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুড্যের 'পত্রোর্ণা' সকলের চেয়ে ভাল, ইহা হইতেই কৌষেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্টবস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জমা। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ভাল জিনিস রাজকোষে রাখিয়া দিতে হইবে তাহার তালিকা আছে, সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে ঐ সকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম 'কোষপ্রবেশ্য রত্ন পরীক্ষা'। এখানে রত্ন শব্দের অর্থ কেবল হীরা জহরৎ নয়, যে পদার্থের যাহা উৎকৃষ্ট সেইটির নাম রত্ন। এই রত্নের মধ্যে অগুরু আছে, চন্দন আছে, চর্ম আছে, পাটের কাপড় আছে, রেশমের কাপড় আছে ও তূলার কাপড় আছে। যে অংশ তর্জমা করা হইল, তাহাতে মগধ ও পৌণ্ড্র দেশের নাম আছে, এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ—দক্ষিণ-বিহার। আর পৌণ্ড্র—বরেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুড্য কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরেণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণকুড্যের নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটি সোনার মত রাঙা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুড্য বলিত। এখানে এখনও রেশমের চাষ হয় এবং এখানকার রেশম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগকেশ্বরের গাছ। নাগকেশর,

বাংলার আর কোনখানে বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ—মাদার গাছ। মাদার গাছেও রেশমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যে ভাবে চীনদেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি চীনদেশের রেশমী কাপড় অপেক্ষা বাংলার রেশমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেশমী কাপড় যে চীন হইতেই বাংলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেশম তুঁতগাছ হইতে হয়। বাংলার রেশমের তুঁত গাছের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং বাঙালী যে রেশমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে, একথা বলিবার জো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে রেশমের চাষ বাংলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁতগাছ দিয়া রেশমের চাষ চীন হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে রেশমের চাষ ছিল, একথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাংলায় ও মগধেই রেশমের চাষ ছিল। কারণ, পৌণ্ড্র ও বাংলায়, সুবর্ণকুণ্ড্য ও বাংলায় চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেশমের চাষ হইত। কারণ, মান্দাসোরে খ্রীষ্টীয় ৪৭৬ অব্দে যে শিলালেখা পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে একদল রেশম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আসিয়া রেশমের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির নির্মাণ করে।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলার বড়ই গৌরবের কথা। যদি বাঙালীরা সকলের আগে রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই উহা সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় তথাপি বাঙালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারা তো আর তুঁতপাতা হইতে রেশম বাহির করিতেন না, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি, যে সকল গাছ বিনা চাষে তাহাদের দেশে প্রচুর জন্মায় সে সকল গাছের পোকা

হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেশম বাহির করিতেন। চীনের রেশম সবই সাদা, তাহা রঙ করিতে হয়। বাংলার রেশম রঙ করিতে হইত না, গাছ বিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সূতা হইত। আর এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। রেশমের চাষ প্রথমে কোথায় হয়েছিল? 'পত্রোর্ণা' কি? ইহার উল্লেখ কোথায় রহিয়াছে? 'পত্রোর্ণা' কোথায় তৈয়ারী হইত? কোন্ কোন্ গাছে এই রেশম পোকা জন্মাইত এবং রেশমের রঙ কেমন ছিল? কৌষেয় বস্ত্র কি?

২। রত্ন কথার অর্থ কি? মগধ ও পৌণ্ড্র দেশ কাহাকে বলা হইত? কর্ণসুবর্ণ কোন দেশকে কি জন্য বলা হয়?

৩। লেখকের মতে চীনের রেশম হইতে বাংলার রেশম শ্রেষ্ঠ কেন? রেশম কি কারণে বাংলার গৌরব?

৪। সূর্য মন্দির কাহারা কোথায় কিভাবে তৈয়ারী করিয়াছিলেন?

৫। রেশমের কথা আমরা কোন্ পুস্তক হইতে জানিতে পারি? এই পুস্তকের লেখক কে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) চীন দেশীয় প্রথায় ভারতে রেশমের চাষ কিভাবে বিস্তার লাভ করে?

(খ) চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে রেশম চাষ সম্বন্ধে কি লেখা আছে আলোচনা কর।

২। (ক) "কোষ প্রবেশ্য রত্ন পরীক্ষা"—ইহা কোন্ গ্রন্থের অধ্যায়? 'রত্ন' কথার অর্থ কি?

(খ) "অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলার বড়ই গৌরবের কথা।"—এই গৌরবের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হলদে রঙের………পট্টবস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

(খ) কৌটিল্য যেভাবে চীনদেশের………বলিয়া মনে করিতেন।

(গ) আর এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) বাক্য রচনা কর : সম্পূর্ণ, প্রাচীনকাল, উপার্জন, পৈতৃক, সুফল।

(খ) অর্থ লিখ : পট্টবস্ত্র, স্বতন্ত্র, নিজস্ব, অগুরু, তর্জমা, উপনিষৎ, নাগবৃক্ষ।

(গ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর : পরিষ্কার, উল্লেখ, সংস্কার।

(ঘ) ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর : সূর্যমন্দির, নাগবৃক্ষ, রাজকোষ, অর্থশাস্ত্র, রাজকন্যা, বিদ্যাশিক্ষা।

(ঙ) টীকা লিখ : অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্য, পত্রোর্ণা, উপনিষৎ, সুবর্ণকুড্য, মগধ, পৌণ্ড, শিলালেখা।

২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) **বাংলার রেশম** রঙ করিতে হইত না।

(২) কারণ তাঁহারা **তুঁত পাতা হইতে** রেশম বাহির করিতেন না।

(৩) **অর্থশাস্ত্র** হইতে আমরা সে সংবাদ পাইলাম।

(৪) বাংলার অন্যতম **গৌরব** রেশমের কাজ।

(৫) **চীনারা** রেশমের চাষ কাহাকেও শিখিতে দিত না।

(খ) নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন কর :

(১) প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকট।

[সরল বাক্যে পরিণত কর।]

(২) ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাষ আরম্ভ করেন। [যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত কর।]

(৩) বাংলার অন্যতম গৌরব রেশমের কাজ।

[জটিল বাক্যে পরিণত কর।]

(৪) চীনারা রেশমের চাষ কাহাকেও শিখিতে দিত না।

['না' পরিহার কর।]

(৫) সুতরাং বাঙালী যে রেশমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে, একথা বলিবার জো নাই। ['হঁা' বাচক বাক্যে পরিণত কর।]

(গ) প্রত্যয় নির্ণয় কর :

রেশমী, কৌটিল্য, প্রসিদ্ধ, বাঙালী, সংস্কার।

মৌখিক

১। (ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি বিখ্যাত আবিষ্কার পুঁথির নাম কর।

(খ) রেশম কি? ইহা কিভাবে উৎপন্ন হয়?

(গ) 'পত্রোর্ণা' কি প্রকারের রেশম? পত্রোর্ণা কোথায় কোথায় হইত?

(ঘ) ইউরোপীয়রা কোন্ দেশ হইতে রেশম পোকা আনাইয়াছিলেন?

(ঙ) রেশমের জন্মস্থান কোথায়?

(চ) কোন্ কোন্ গাছে রেশম পোকা জন্মাইত এবং সেই সব রেশমের রঙ কিরূপ ছিল?

(ছ) চীন দেশের রেশমের রঙ কিরূপ ছিল?

(জ) অর্থশাস্ত্র কে রচনা করিয়াছিলেন? এই পুস্তক হইতে কি জানা যায়?

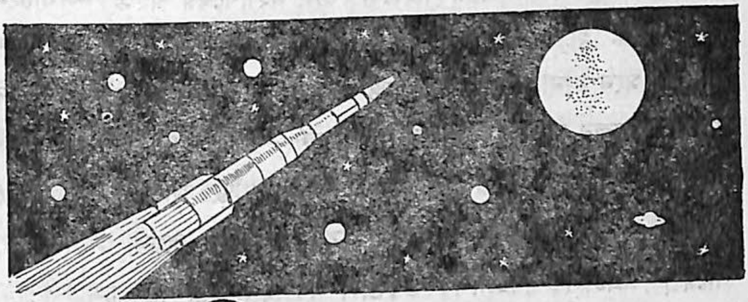
২। (ক) কৌষেয় বস্ত্র ও পট্ট বস্ত্রের পার্থক্য কি?

(খ) সুবর্ণকুড্য কোথায় অবস্থিত ছিল?

(গ) নাগবৃক্ষ, লিকুচ কি?

(ঘ) মান্দাসোর শিলালেখাতে কি লিখা আছে?

(ঙ) তুঁত পাতা হইতে প্রথমে কোন্ দেশে রেশম বাহির হইত?



চন্দ্র অভিযান • নির্মলেন্দু দাস

(মানব সভ্যতার ইতিহাসে চন্দ্র-অভিযান এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই চন্দ্রকে ঘিরে নানা কাহিনী, উপকাহিনী, ছড়া, কবিতা প্রভৃতি রচিত হয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষ চন্দ্র অভিযানের স্বপ্ন দেখে এসেছে। চন্দ্র অভিযান মানুষের সেই দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলশ্রুতি। আলোচ্য প্রবন্ধে চন্দ্র অভিযানের সেই রোমাঞ্চকর অধ্যায়টি তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।)

মানব সভ্যতার ইতিহাসে চন্দ্র বিজয় এক রোমাঞ্চকর যুগান্তকারী ঘটনা। যুগ যুগ ধরে মানুষ মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে সুদূর গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছে—অজানাকে জানার ব্যাকুল বাসনা নিয়ে ছুটে চলেছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে—স্বপ্নে বিচরণ করেছে কল্পলোকের এক দূরতিক্রম দেশে। তারই ফলে কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গমকে জয় করার জন্য সে অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছে। কারণ পৃথিবীর সীমায়িত গণ্ডীকে আশ্রয় করে মানুষ কোনদিন সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি। তাই আরো ব্যাপকতার সন্ধানে পৃথিবীর বাস্তবলোকের শেষ সীমা অতিক্রম ক'রে সে চলে গেছে দূরে—বহুদূরে—কল্পনার রাজ্যে। তাই চাঁদকে নিয়ে যুগ যুগ ধরে চলেছে নানা জল্পনা-কল্পনা, নানা গবেষণার—সৃষ্টি হয়েছে অজস্র ছড়া কাব্য কাহিনী।

কিন্তু চাঁদ সম্পর্কে নানা কাহিনী উপকাহিনী নিয়ে মানুষ চুপ করে বসে থাকে নি—তাকে জয় করবার প্রবল বাসনাও সে মনে মনে পোষণ করে এসেছে। এরই ফলে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার

করেন এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি মহাবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। পরবর্তীকালে কেপলারের গ্রহ গতিতত্ত্ব মানুষের মনে নানা কৌতূহল সৃষ্টি করল। তারপর নিউটন যেদিন ব্যাখ্যা করলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তাৎপর্য—তখন থেকেই গ্রহ নক্ষত্র মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে—চাঁদে পাড়ি জমাবার কল্পনা সে করেছে। কিন্তু কিভাবে মানুষের সেই স্বপ্ন ও কল্পনা সার্থক হতে পারে? প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অবলম্বন করে গল্প রচনা করলেন এডগার অ্যালেন পো, হেল, এইচ. জি. ওয়েলস্, জুল ভার্ন এবং আরো অনেকে। এঁরা স্বপ্ন দেখলেন যে, পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে বিচরণ করেছে। ১২০ খ্রীষ্টাব্দে লুলিয়ান রচিত 'ট্রু হিসটোরি' গ্রন্থে প্রথম চন্দ্র অভিযানের একটি বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিবরণে রাজহাঁসের পিঠে চড়ে মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে সাইরোনো ত্য বারজারস রকেট চালিত একটি মহাকাশযানের বর্ণনা দেন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত কল্পকাহিনীকার জুল ভার্নের গল্পে কামানের গোলার মুখে চড়ে চন্দ্র অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনীর আভাস পাওয়া যায় এবং এর সঙ্গে আধুনিক রকেট চালিত চন্দ্রযানের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

এই আধুনিক রকেটের প্রাচীন সংস্করণটি তৈরি করেছিলেন চেঙ্গিস খাঁর পুত্র ওগোদাই। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওগোদাই এক দুর্ধর্ষ মোঙ্গলবাহিনী নিয়ে ফাই ফাঙ্ ফু শহর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে তিনি হাউই-এর মত এক ধরনের আগুনের গোলা ব্যবহার করে-ছিলেন; রকেটের উদাহরণে চমৎকারিত্ব এনেছিলেন ভারতের (দাক্ষিণাত্যের) হিন্দু রাজগণ, ঐতিহাসিকদের মতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে কয়েকজন হিন্দু রাজা কতকগুলি রকেট তৈরি করেছিলেন—সেগুলিকে আধুনিক মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্রের প্রাচীন সংস্করণ বলা যেতে পারে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের মতে ভারতীয় কুশলীদের হাতে-গড়া এই ক্ষেপণাস্ত্র যথেষ্ট উন্নত ধরনের ছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরের সুলতান এমন ধরনের একদল রকেটধারী বাহিনী নিয়ে

শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে বৃটিশ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিসকে পরাজিত করেন। এই রকেটের পাল্লা দেড় মাইলের মত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বোঝা গেল, যদি মহাকাশে মানুষকে পাড়ি জমাতে হয়, তা হলে একমাত্র রকেট দ্বারাই তা' সম্ভব। রকেটের সংস্কার সাধনের ব্যাপারে সারা ইউরোপ একদিন যুগান্তকারী উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন প্রখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়ম কনগ্রেভ। কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করে যে সমস্ত রকেট তিনি তৈরি করেছিলেন তা' প্রধানতঃ যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার পর শুরু হ'ল মহাকাশ যাত্রার আধুনিক যুগ। রকেটের পাল্লা যত বাড়তে লাগল—মানুষের কল্পনাও তত বাড়তে লাগল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চলল চন্দ্র অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান হোতা। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে আমেরিকার তিনজন নভশ্চর পৃথিবীর মানুষের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চাঁদের দেশের সত্তর মাইল এলাকার মধ্যে গিয়ে চাঁদ সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে মানুষের চাঁদে অবতরণের পথ প্রশস্ত করলেন।

অবশেষে মানুষের চাঁদে অবতরণের শুভদিন ঘনিয়ে এল। তিন মানব সন্তান পৃথিবীর মানুষের নিকট হতে বিদায় নিয়ে চাঁদের দেশে পদার্পণ করতে যাত্রা করলেন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই আমেরিকান নিল আরমস্ট্রং, মাইকেল কলিনস এবং অলড্রিন চাঁদের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর মাটি ত্যাগ করেন। ২০শে জুলাই তারিখে মূল মহাকাশযান কলম্বিয়ায় রক্ষিত চাঁদের ভেলা ঈগলে চড়ে আরমস্ট্রং ও অলড্রিন নামলেন চাঁদের তন্দ্রাসাগরে—আর চাঁদ থেকে একশত এগার মাইল দূরে ঊর্ধ্বাকাশে চাঁদকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন কলিনস। ২১শে জুলাই সকাল এগারোটা একান্ন মিনিটে আরমস্ট্রং চাঁদের ভেলার সিঁড়ি বেয়ে নামলেন চাঁদের মাটিতে।

পৃথিবীর একজন মানুষ এই প্রথম চাঁদের মাটিতে পা দিয়ে নতুন জগতের অধিবাসী হয়ে গেলেন। তারপর অলড্রিন নামলেন। সার্থক হ'ল মানুষের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ও সাধনা—অপরিচিতকে টেনে আনল পরিচিতের গণ্ডিতে।

আজ থেকে ঊনত্রিশ বৎসর পূর্বে বিশ্ববিখ্যাত কল্পকাহিনীকার আর্থার, সি ক্লার্কের দিনলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সেদিন লিখেছিলেন—১৯৮০-র মধ্যে মানুষ অন্য গ্রহে অবতরণ করবে এবং ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই সেখানে আমরা উপনিবেশ স্থাপন করতে পারব। কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি হবে ২০৬০-এর মধ্যে। অমরত্ব লাভ ২০৯০ খ্রীষ্টাব্দে। আর চাঁদে অবতরণ? ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দতেই সম্ভাবনাটা বেশি। অদ্ভুত এই ভবিষ্যৎবাণী। আজকের মহাকাশের সাফল্য হয়তো একদিন সেই সম্ভাবনার দ্বারা উন্মোচিত করবে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। 'চন্দ্র অভিযান' কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখ।

২। প্রথম চাঁদের মাটিতে কে পদার্পণ করিয়াছিলেন? তিনি কি ভাবে চাঁদের মাটিতে পদার্পণ করিলেন তাহা লিপিবদ্ধ কর।

৩। কি ভাবে মানুষের স্বপ্ন ও সাধনা সফল হইয়াছিল? কে ঊনত্রিশ বৎসর পূর্বে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন? তিনি কি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন তাহা লিখ।

৪। রকেটের অগ্রগতি সম্পর্কে যাহা জান লেখ।

৫। কে প্রথম রকেট আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাহা কোথায় তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন?

৬। দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজারা কি ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার জানতেন? মহীশূরের সুলতান কোথায় এবং কাকে এই ধরনের রকেট বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "কিন্তু চাঁদ সম্পর্কে নানা কহিনী উপকাহিনী নিয়ে মানুষ চুপ করে বসে থাকে নি—তাকে জয় করার প্রবল বাসনাও সে মনে মনে পোষণ করে এসেছে।"

—চাঁদকে জয় করার প্রবল বাসনা লোকে যে মনে মনে পোষণ করিয়াছিলেন তাহার দুই একটি উদাহরণ দাও।

(খ) ...আধুনিক রকেটের প্রাচীন সংস্করণ কে তৈরী করিয়াছিলেন ? তার সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বল।

(গ) "তিন মানব সন্তান পৃথিবীর মানুষের নিকট হইতে বিদায় নিয়ে চাঁদের দেশে পদার্পণ করতে যাত্রা করলেন।"—এই তিন মানব সন্তানের নাম কি ? তাঁহারা কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন ? তাঁহারা কিভাবে চাঁদে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) কারণ, পৃথিবী...... কল্পনার রাজ্য।

(খ) তারপর নিউটন.........সে করছে।

(গ) রকেটের পাল্লা.........বাড়তে লাগল।

(ঘ) ১৯৮০-এর.........ভবিষ্যৎবাণী।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) বাক্য রচনা কর :

দুরতিক্রম্য, ব্রতী, অতিক্রম, তাৎপর্য, বিবরণ, আভাস, প্রখ্যাত, উপনিবেশ, সম্ভাবনা, উন্নত।

(খ) ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর :

মর্ত্যসীমা, রোমাঞ্চকর, যুগান্তকারী, কল্পলোক, বাস্তবলোক, কল্পকাহিনী, ক্ষেপণাস্ত্র, দূরবীক্ষণ।

(গ) অর্থ লিখ :

দূরবীক্ষণ, ক্ষেপণাস্ত্র, দুর্গম, অতিক্রম, রহস্য, মাধ্যাকর্ষণ, অবলম্বন।

(ঘ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

দুর্গম, ক্ষেপণাস্ত্র, মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার, গ্রহান্তর, যথেষ্ট।

(ঙ) পদ পরিবর্তন কর :

যন্ত্র, স্বপ্ন, আশ্রয়, সন্তুষ্ট, প্রবল, আবিষ্কার, দুর্গম, উন্নত, ব্যবহৃত, সম্পর্ক, রক্ষিত।

(চ) প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয় কর :

প্রখ্যাত, সৃষ্টি, দুর্ধর্ষ, প্রদক্ষিণ।

২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) **চাঁদকে** নিয়ে যুগ যুগ ধরে চলেছে নানা জল্পনা-কল্পনা।

(২) এরই ফলে **গ্যালিলিও** দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করলেন।

(৩) এই বিবরণে রাজহাঁসের **পিঠে চড়ে** মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

(৪) এই রকেটের **পাল্লা** দেড় মাইলের মত ছিল।

(৫) তারপর **অলড্রিন** নামলেন।

(খ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

এই আধুনিক রকেটের প্রাচীন সংস্করণটি তৈরী করেছিলেন চেঙ্গিস খাঁর পুত্র এগোদাই। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওগোদাই এক দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী নিয়ে ফাই ফুঙ্ ফু শহর আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে তিনি হাউই-এর মত এক ধরনের আগুনের গোলা ব্যবহার করেছিলেন।

মৌখিক :

১। (ক) চাঁদ লইয়া কে কে গল্প রচনা করিয়াছিলেন ?

(খ) জুল ভার্ণের গল্পের বিবরণ দু'এক কথায় বল।

(গ) আধুনিক রকেটের সংস্করণ কে তৈরী করেছিলেন ?

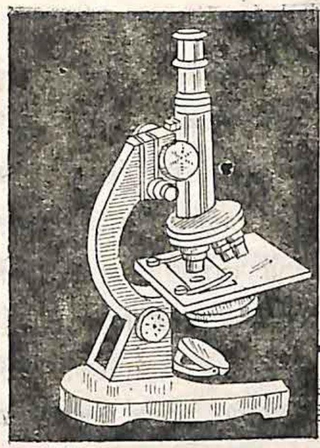
(ঘ) কত তারিখে পৃথিবীর মানুষ মাটি ত্যাগ করিয়া চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় ?

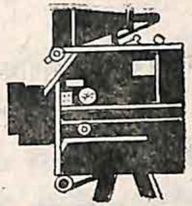
(ঙ) আর্থার সি. ক্লার্কের দিনলিপিতে কি ছিল ?

২। (ক) কত তারিখে মানুষ প্রথম চাঁদে অবতরণ করে ?

(খ) কে কে মহাকাশ পাড়ি দিয়াছিলেন ?

(গ) দূরবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন ?





রঞ্জনরশ্মি

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

[জন্ম ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন এবং মৃত্যু ২৬শে আগস্ট ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ। চব্বিশ পরগণার হরিশতিতে ইহার জন্ম হয়। ইনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিশ্বভারতী ও অন্যান্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি রত থাকিলেও বাংলা সাহিত্যের জন্য বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'নব্য বিজ্ঞান', 'বাঙালীর খাদ্য', 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু', 'বিশ্বের উপাদান', 'ব্যাধির পরাজয়', 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান প্রবন্ধটিতে 'রঞ্জন রশ্মি'-র আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে।]

একস্-রশ্মির আবিষ্কারক রন্টশেনের নাম আজ জগৎবিখ্যাত। তাঁর এই খ্যাতির সূচনা ছিল তাঁর দুটি খেয়াল—একটি ফটোগ্রাফি চর্চা আর একটি কাচের নল গলিয়ে তার বিভিন্ন রূপ দেওয়া।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রুশিয়ার এক শহরে রন্টশেন জন্মগ্রহণ করেন। জুরিকে অধ্যাপক কুণ্ডের কাছে তিনি লেখাপড়া শেখেন, পরে তাঁর গুরুর সহকারী রূপে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে নানা পরীক্ষাগারে বিবিধ পরীক্ষা চলছিল। দেখা গেল বায়ু ভেদ করে যখন তড়িৎপ্রবাহ যায় তখন অনেক বিস্ময়কর ও চমৎকার চমৎকার ব্যাপার ঘটে। সাধারণ অবস্থায় বায়ু তড়িৎপ্রবাহে প্রচণ্ড বাধা দেয়, কিন্তু একটা কাচের বদ্ধ পাত্র থেকে ধীরে ধীরে যদি বায়ু নিষ্কাশিত করা যায় তবে পাত্রটা নানা বর্ণের আলোতে রঞ্জিত হতে থাকে। ক্রাক্স্ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার পর বহু বিজ্ঞানী তাঁদের

পরীক্ষাগারে নানা পরীক্ষা করতে থাকেন। এই রকমের এক পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন রন্‌টশেন। তিনি কাচের বাল্‌ব নিজেই তৈরি করেছিলেন, আর তা যথাসম্ভব বায়ু মুক্ত করে তার ভিতর তড়িৎ মোক্ষণ পাঠাচ্ছিলেন। যে ডেস্কের উপর পরীক্ষা হচ্ছিল তাতে স্তূপাকার বই, কাচের নল, ফটোগ্রাফির প্লেট প্রভৃতি ছিল। সেদিন কাগজে মোড়া একটি ফটোগ্রাফির প্লেটের উপর একখানা বই ছিল আর কতদূর পড়া হয়েছে তার চিহ্নস্বরূপ বই-এর মধ্যে একটি চাবি ছিল। এর দু-একদিন পরে বাইরের একটা দৃশ্যের আলোকচিত্র নিতে তিনি ওই প্লেট ব্যবহার করলেন। প্লেটটা ডেভেলাপ করে দেখলেন তাতে একটা চাবির ছায়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁর ছাত্রদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তাদের কেউ ওই প্লেট নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে কিনা। সকলেই 'না' বলল। তখন তিনি এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করলেন। তিনি ডেস্কের উপর আগের জিনিসগুলো সাজালেন, যে ভাবে সেগুলি সাজান ছিল ঠিক সেই রকমে। বাল্‌বের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ পাঠালেন, প্লেটটা ডেভেলাপ করলেন, চাবির ছবি ঠিক আগের মতোই দেখা গেল।

এখন রন্‌টশেন নানা রকমের জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন, লক্ষ্য করলেন যে, ওই বিস্ময়কর অদৃশ্য রশ্মি বই-এর পাতা ছাড়া আরও বহু জিনিস ভেদ করে যেতে পারে। কয়েক মাস ধরে পরীক্ষা চলল, কিন্তু তিনি ঐ অদৃশ্য রশ্মিকে দৃষ্টিগোচর করবার কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল যে, পাত্রের কাচ যখন তড়িৎ মোক্ষণে দীপ্তি দেয় তখনও অদৃশ্য আলোকপাতে অন্য জিনিসও ভাস্বর হতে পারে। একে একে পঞ্চাশ রকমের জিনিস নিয়ে তিনি পরীক্ষা করে গেলেন। শেষে লক্ষ্য করলেন যে, অদৃশ্য আলো যখন বেরিয়ম প্লাটিনোসায়ানাইডের উপর পড়ে তখন ওই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়, তিনি এখন একটা কার্ডবোর্ডের একদিকে একখানা কালো কাগজ আঁটলেন, আর

অন্য দিকটায় বেরিয়ম প্লাটিনোসায়ানাইড মাখালেন। দেখা গেল অদৃশ্য আলো পড়লে এই দিকটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অঙ্কশাস্ত্রে যেটা অজ্ঞাত থাকে তাকে এক্স্ বলা হয়। রন্টশেন এই নতুন পাওয়া অজ্ঞাত অপরিচিতের নাম দিলেন এক্স্-রশ্মি। এই রশ্মি আলোর সাধারণ নিয়ম তুচ্ছ করে অনচ্ছ কালো কাগজ ভেদ করে বেরিয়ে এল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রন্টশেন বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁর নতুন আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। বিদ্যুৎবেগে এই সংবাদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল।

এখন রন্টশেন ভাবতে লাগলেন ওই রশ্মি যখন কালো কাগজ ভেদ করল তখন আর কি কি অস্বচ্ছ জিনিসের মধ্য দিয়ে যেতে পারে? অনুসন্ধান আরম্ভ হল। বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড পর্দা আর ওই নলের মধ্যে রন্টশেন হাজার পৃষ্ঠার একখানা বই এবং পর পর দু প্যাকেট তাস ধরলেন, রশ্মি সে সব ভেদ করে পর্দাকে উদ্দীপ্ত করল। কিন্তু তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়ামের পাতা ভেদ করে যেতে পারল না। ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের নানা পর্দা ধরে রন্টশেন লক্ষ্য করলেন যে, যার ঘনত্ব বেশি তার ভিতর দিয়ে রশ্মি সে রকম যেতে পারে না, কম ঘনত্বের জিনিসই ভেদ করে যায়। রন্টশেন নিজের হাতে রাখলেন, দেখলেন, যেখানে হাড় রয়েছে রশ্মি সেই হাড় ভেদ করে যেতে পারল না, কিন্তু মাংস ভেদ করে অনেক পরিমাণে গেল। কাজে কাজেই পর্দার উপর হাতের ভিতরকার হাড়ের ছবি স্পষ্ট দেখা গেল। জার্মানীতে যেদিন রন্টশেন এক্স্-রশ্মি আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন তার তিন দিন পরে মানুষের দেহের ভিতরকার হাড়ের ছবি লণ্ডনের বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করল। এক আকস্মিক ঘটনা থেকে রন্টশেন পদার্থবিদ্যার ও চিকিৎসাবিদ্যার নতুন নতুন প্রবেশ পথ খুলে দিলেন; যা দৃষ্টির অগোচর ছিল মানুষ তা দেখল।

কিন্তু কি এ অদৃশ্য রশ্মি, এর প্রকৃতি কি? আলো হতে পারে না, কারণ এ যে অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করে চলছে। ওই জাতীয় আর

কিছু কি ? একথার মীমাংসা আরও পরে হল। প্রমাণিত হল যে, আলো যেমন ইথার তরঙ্গ এক্স্-রশ্মিও তাই, তবে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুবই ছোট, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্রা। মানুষ নানারকমে এক্স্-রশ্মিকে কাজে লাগাল। লোহার ভিতরে কোন দোষ আছে কিনা এক্স্-রশ্মি ধরে দিল, আবার হীরা জহরৎ খাঁটি কিনা এক্স্-রশ্মি তা বলে দিল। দেহের মধ্যে কোথায় হাড় ভেঙ্গে গেছে এক্স্-রশ্মি তা দেখিয়ে দিল ; আবার ডাক্তার দেখে নিলেন, সরে যাওয়া হাড় ঠিক মত বসিয়েছেন কিনা। শিশু খেলা করতে করতে সিকিটা গিলে ফেলেছে। এক্স্-রশ্মি তা দেখিয়ে দিল। মানুষের হৃদয়যন্ত্রের আকার অবস্থিতি এক্স্-রশ্মি চোখের সামনে ধরল। ফুসফুস যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত কিনা, কিড্‌নীতে পাথর আছে কিনা, এক্স্-রশ্মি ফটোগ্রাফ তার সাক্ষ্য দিল। এক্স্-রশ্মি দিয়ে বায়স্কোপের ফিল্ম তুলে মানুষের ফুসফুস কি রকম কাজ করছে দেখা গেল। বেরিয়ম সালফেট এক্স্-রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ। একজনকে বেরিয়ম সালফেট খাওয়ান হল, ওটা যখন অন্ত্রের মধ্যে ঢুকল তখন এক্স্-রশ্মি ফটোগ্রাফ নেওয়া হল, অন্ত্রের ছায়া পড়ল, অন্ত্রের পথ স্বাভাবিক আছে কিনা জানা গেল। বেশী ভোল্টে চালিত বাল্‌ব থেকে যে এক্স্-রশ্মি বেরল তা দেহের ভিতরকার ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ হল। সম্প্রতি কলিকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইনষ্টিটিউটে দশ লক্ষ ভোল্টে চালিত একটি এক্স্-রশ্মির সরঞ্জাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চিকিৎসা জগতে এক্স্-রশ্মি যুগান্তর আনল।

এক্স্-রশ্মির আবিষ্কার হল হঠাৎ। বৈগ্রানিক আবিষ্কারের ইতিহাসে এরকম বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু হঠাৎ হলেও প্রকৃতি তার দরজা একটু একটু করে খুলে দেন শুধু তাঁকেই যিনি ওই দরজায় অনবরত ঘা দিতে থাকেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রন্টগেন তাঁর আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন। তিনি দীর্ঘকাল ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের

অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক-গমন করেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। এক্স্‌-রশ্মি কি? ইহার অপর কোন নাম থাকিলে বল। কে কিভাবে ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন?

২। রঞ্জন রশ্মি কিভাবে মানুষের উপকার সাধন করে?

৩। এক্স্‌ রশ্মির সাহায্যে কিরূপ ফটো তোলা হয়?

৪। রনটশেন তাঁর আবিষ্কারের জন্য কি সমাধান লাভ করিয়াছিলেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "তাঁর এই খ্যাতির সূচনা ছিল তাঁর দুটি খেয়াল"—কার কথা বলা হয়েছে? খেয়াল দুইটির নাম কি?

(খ) "এই নতুন পাওয়া অজ্ঞাত অপরিচিতের নাম দিলেন এক্স্‌-রশ্মি।"—কে এই নাম দিয়াছিলেন? 'এক্স্‌' কথার অর্থ কি? কিভাবে এই রশ্মির তত্ত্ব প্রকাশিত হলো? কত খ্রীষ্টাব্দে এই রশ্মির কথা বৈজ্ঞানিক জগতে প্রকাশিত হয়েছিল?

(গ) "মানুষ নানারকমে এক্স্‌ রশ্মিকে কাজে লাগাল"—কি কি ভাবে মানুষ এক্স্‌-রশ্মিকে কাজে লাগাল?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) এক আকস্মিক.........ছিল মানুষ তা দেখল।

(খ) কিন্তু হঠাৎ.........অনবরত ঘা দিতে থাকেন।

(গ) বেশী ভোল্টে চালিত.........রশ্মি যুগান্তর আনল।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) বাক্য রচনা কর:

পদার্থবিদ্যা, অনবরত, দুরারোগ্য, ঘনত্ব, তড়িৎপ্রবাহ।

(খ) অর্থ লিখ:

ঘনত্ব, বিস্ময়কর, মীমাংসা, অস্বচ্ছ, মোক্ষণ, চিহ্ন স্বরূপ, দৃষ্টিগোচর।

(গ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

পরীক্ষা, আবিষ্কার, স্তূপাকার, পরিষ্কার।

(ঘ) সমাস নির্ণয় কর (ব্যাসবাক্যসহ) :

দৃষ্টিগোচর, বিস্ময়কর, অস্বচ্ছ, স্তূপাকার, দুরারোগ্য, পদার্থ বিদ্যা, তড়িৎ প্রবাহ।

(ঙ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর :

চমৎকার, ঘনত্ব, উদ্দীপ্ত, বিজ্ঞানী, প্রচণ্ড।

(চ) টীকা লিখ :

নোবেল পুরস্কার, ক্যানসার, যক্ষ্মারোগ, বায়স্কোপ, কিড্‌নী, পদার্থবিদ্যা।

২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) কয়েক **মাস** ধরে পরীক্ষা চলল। (২) **বালবের** মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ পাঠালেন। (৩) কম ঘনত্বের জিনিসই **ভেদ** করে যায়। (৪) **ইতিহাসে** এরকম বড় একটা দেখা যায় না। (৫) একথার **মীমাংসা** আরও পরে হল।

(খ) নির্দেশ অনুযায়ী বাক্য পরিবর্তন কর :

(১) অনুসন্ধান আরম্ভ হল। [বাচ্য পরিবর্তন কর।]

(২) প্লেটটা ডেভেলাপ করে দেখলেন তাতে একটা চাবির ছায়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। [সরল বাক্যে পরিণত কর।]

(৩) সকলেই 'না' বলল। [বাক্যটি হইতে 'না' পরিহার কর।]

(৪) যা দৃষ্টির অগোচর ছিল মানুষ তা দেখল। [সরল বাক্যে পরিণত কর।]

(৫) শিশুটি খেলা করতে করতে সিকিটা গিলে ফেলেছে।] [প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত কর।]

মৌখিক

১। (ক) 'রঞ্জন রশ্মি' পাঠ্যাংশটির লেখক কে? (খ) রন্‌টগেন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (গ) তিনি কোথায় কোন্ অধ্যাপকের নিকট পড়াশুনা করিয়াছিলেন? (ঘ) বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইড কি? (ঙ) 'এক্‌স্ রশ্মির' অর্থ কি? (চ) 'পদার্থ বিদ্যা' ও চিকিৎসা বিদ্যা বলিতে কি বুঝ?

২। (ক) রন্‌টগেন কত খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন?

(খ) তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কত খ্রীষ্টাব্দে?

(গ) তিনি কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন?





ভারতের মুক্তি সংগ্রাম

পরমানন্দ হালদার

[পলাশীর যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়। তারপর ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে নানা অত্যাচার এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গণচেতনা ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হয়। একে একে সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির মাধ্যমে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণের প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুক্তি আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দ্রুততর করে তোলে।]

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হয় এবং নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু সিংহাসনে বসার অতি অল্পকাল সময়ের মধ্যে সিরাজদ্দৌল্লাকে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে পলাশী প্রান্তরে সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে ইংরেজদের ঐতিহাসিক যুদ্ধ শুরু হয়। পলাশীর প্রান্তরে নবাবের পরাজয় ঘটল এবং বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হল।

ইংরেজদের সহায়তায় মীরজাফর মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে নামে মাত্র নবাব হয়ে বসলেন—প্রকৃতপক্ষে ইংরেজই বাংলার শাসন ক্ষমতা চালাতে লাগলেন। মীরজাফর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশের শাসনব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেন না। পরন্তু ইংরেজদের বহু অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হল। কিছু-দিনের মধ্যেই ইংরেজরা মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাশিমকে

বাংলার মসনদে বসালেন। মীরকাশিম সিংহাসনে বসেই নিজের সৈন্যবাহিনীকে পুনর্গ ঠনের জন্য সচেষ্ট হলেন এবং ইংরেজদের বাণিজ্য শুল্ক দিতে অস্বীকার করলেন। ফলে তাঁর সঙ্গেও ইংরেজদের যুদ্ধ বাধল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে মীরকাশিম সম্রাট্ শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাবের সহায়তায় ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করার জন্য সচেষ্ট হলেন। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম ও সম্রাটের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজের নিকট পরাজিত হলেন। বাংলার শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তিই ইংরেজদের ভারত বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে তুলল। একে একে মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যগুলিও ইংরেজদের দখলে আসে।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে লাগল। ইহার কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে ইংরেজ বণিকেরা একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ স্বদেশে পাঠাবার ফলে দেশীয় লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হতে লাগল। ফলে ইংরেজ বণিকদের সম্পর্কে জনসাধারণের মনে দারুণ বিতৃষ্ণার সঞ্চার হতে আরম্ভ করল। তাছাড়া ইংরেজ বণিকদের ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির ফলে সাধারণ কৃষক ও জমিদার শ্রেণীর অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করল। সামাজিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারেও জনগণের মধ্যে নানা অসন্তোষ দেখা দিতে আরম্ভ করল। ইংরেজ মিশনারীগণ অবাধে এদেশে এসে হিন্দুদের জোর-পূর্বক অথবা উৎকোচ দ্বারা ধর্মান্তরিত করতে লাগল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই অসন্তোষ এবং ঘৃণা শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না—ইংরেজের অধীনে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও তা ব্যাপ্ত হতে লাগল। সৈন্যবাহিনীতে ইংরেজের মধ্যে অফিসার নিয়োগ করা হত—আর ভারতীয়দের সাধারণ সৈনিক বা সিপাহী হিসাবে নিযোগ করা হত এবং তাঁদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। এমন কি পদোন্নতির সুযোগ ছিল না। তাঁদের একস্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াতের জন্য কোন খরচাদিও দেওয়া হত না।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বর্মার যুদ্ধের জন্য একদল সিপাহীকে ব্যারাকপুরে আনা হয়। তাঁদের মালপত্র বহনের খরচ কর্তৃপক্ষ দিতে অস্বীকার করায় তাঁরা পিঠে থলি নিয়ে কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করতে রাজী হল না। তা'ছাড়া সিপাহীদের এক অংশ জলপথে রেঙ্গুন অথবা অন্য কোথাও যেতে অসম্মতি প্রকাশ করল। কলিকাতা হতে গোরাসৈন্য এনে সিপাহীদের উপর গুলি বর্ষণ করা হল। ফলে বহু সিপাহী হতাহত হয়। এর এক বৎসর পরে আসামের সিপাহীরা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে কুচকাওয়াজ করতে অস্বীকার করল। ফলে সিপাহীদের দলপতিদের কারারুদ্ধ করা হয়। অন্যান্য সিপাহীরাও তাদের সঙ্গে কারারুদ্ধ হওয়ার দাবী জানাল। সামরিক বিচারে দলপতিদের মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সিপাহীদের বরখাস্ত করা হল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর বিশেষ ভাতার দাবিতে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সোলাপুরে সিপাহীরা কুচকাওয়াজে যোগ দিতে অস্বীকার করল। তাদের পরে অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে কারারুদ্ধ করা হল এবং দুই বৎসর কারাবাসের পর তাদের চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হল। এই বিশেষ ভাতার দাবিতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ, মালিগার প্রভৃতি স্থানের সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং কয়েকটি বাহিনীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধে একদল সিপাহীকে আফগানিস্থানে পাঠান হল। হিন্দু সিপাহীদের ধারণা হল যে তারা অন্য জাতের হাতের খাবার খেয়ে জাতিচ্যুত হয়েছে। মুসলমান সিপাহীদের মধ্যেও অনুরূপ অসন্তোষ দেখা দিল। কেননা, তাদের একই ধর্মের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এই অসন্তোষ ব্যক্ত করার জন্য একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান সুবেদারকে গুলী করে মারা হল। এই সমস্ত কারণে ভারতের সর্বত্র সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীদের মধ্যে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা

দিল। পলাশী যুদ্ধের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হল এক রক্তাক্ত বিপ্লব ও বিষাদময় পরিণতির মধ্যে। সিপাহীদের মধ্যে এক জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ল যে রাইফেলের টোটায় শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত থাকে এবং এই টোটা দাঁত দিয়ে কেটে রাইফেলে ভরতে হত। ফলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের জাতিচ্যুত করার জন্য টোটায় শূকর ও গরুর চর্বি মিশান হয়েছে এই জনশ্রুতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বহরমপুরের সিপাহীদের প্রতি অত্যাচার এবং ব্যারাকপুরের সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডের প্রাণদণ্ডের ঘটনা ভারতে বিভিন্ন স্থানের সিপাহীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে প্রথম প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয় পাঞ্জাবের আম্বালা ও মীরাটে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে রবিবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক সহস্র সিপাহী জেলে আটক সিপাহীদের মুক্ত করল এবং ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নেল ফিন্নিসকে গুলি করে মেরে ফেলল। তারপর সমবেত সিপাহীরা ইউরোপীয়ানদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিল এবং নারী-শিশু নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করা হল। যারা বেঁচে ছিল তারা দিল্লী হতে পালিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করল। দিল্লী সম্পূর্ণরূপে সিপাহীদের আয়ত্বে এসে গেল। ভারত-বর্ষের অন্যান্য স্থানেও মীরাটের অনুরূপ ঘটনা ঘটল। কিন্তু সিপাহীদের এই বিদ্রোহ বিক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে এবং সিপাহীদের মধ্যে ঐক্যের অভাবে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। কিন্তু ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের মুক্তি আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে এদেশে ওহাবি আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ভারতে পুনরায় মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের চেয়ে ধর্মনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত এই আন্দোলন দেশপ্রেমের দ্বারা সংগঠিত হয় নি। তবে ওহাবি আন্দোলন পূর্বের আন্দোলনগুলির চেয়ে অধিক সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত ছিল। তবে ইংরেজ সরকার এই

আন্দোলনের মূলচ্ছেদ করার জন্য বহু ওহাবিকে নির্বাসিত করেন। ইহার পর পাঞ্জাবে কুকা আন্দোলন (১৮৭২ খ্রীঃ), বীরষা আন্দোলন (১৮৯৫ খ্রীঃ) প্রভৃতি ধর্মীয় আন্দোলনকে ইংরেজ সমূলে বিনাশ করেন।

উনবিংশ শতকের প্রথম হতে ইংরেজ সরকার এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে ভারত-বাসীর চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হলেন। এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করে এদেশের যুক্তি ও আধুনিক মননশীল চিন্তার মাধ্যমে দেশবাসীর সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। তার ফলে এদেশে ধর্ম সংস্কারের কাজ শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয়ের ফলে রাজনৈতিক জীবনে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে জনগণের মধ্যে নতুন চেতনার উদ্ভব হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রাহ্ম সমাজের গঠনতন্ত্রে ভারতবাসীর জন্য গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ করা হয়। এই সময় নবগোপাল মিত্র পরিচালিত 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭ খ্রীঃ), মনোমোহন বসুর জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে (১৮৭২ খ্রীঃ) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমানাধিকারের আদর্শ ভারতীয় বিজ্ঞান সভার (১৮৭৬ খ্রীঃ) জাতায় আদর্শকে মূল মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা সর্বত্রই স্বাদেশিক আন্দোলন ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল। এই যুগের স্বাদেশিক আন্দোলনের সঙ্গে সমাজ ও ধর্মচেতনার গভীর যোগাযোগ ছিল এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে তুলেছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে 'ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাস নতুন পথে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী পনের বৎসর জাতীয় কংগ্রেসের নানা আন্দোলন ও পুনর্গঠনের ফলে জাতীয় কংগ্রেস ধীরে ধীরে ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠল। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তদীয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম আন্দোলনের ফলে অবহেলিত গণদেবতার জয় ঘোষিত হল এবং হিন্দুধর্ম ও সমাজের আন্দোলনকে একটা আশাবাদী ও স্বাদেশিক আত্মগৌরব পূর্ণ উন্নততর আদর্শ ও পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ করল। তার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে একটা নবজাগরণের সূচনা দেখা দিল এবং ভারতীয় জনগণ জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দ্রুততর করে তুলল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধটির সার সঙ্কলন কর।
২। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৩। ওহাবি আন্দোলন কেন হইয়াছিল এবং এই আন্দোলনের ফল কি হইয়াছিল লিখ।
৪। বাংলাদেশে কিভাবে নবজাগরণের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে লাগল।"—ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অসন্তোষের কারণ কি?
(খ) "এই সমস্ত কারণে ভারতের সর্বত্র সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করল।"—কি কি কারণে ভারতের সর্বত্র সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ চরম আকার ধারণ করিয়াছিল?
(গ) "১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে এদেশে ওহাবি আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়।"—এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি ছিল? আন্দোলনের ফল কি হইয়াছিল?

(ঘ) "উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে একটা নবজাগরণের সূচনা দেখা দিল।"—এই নবজাগরণের কারণ কি? কিভাবে এই নবজাগরণের সূচনা ঘটিয়াছিল?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল·········চিহ্নিত করা যেতে পারে।

(খ) উনবিংশ শতকের·········পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হলেন।

(গ) পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে·········চেতনার উদ্ভব হয়।

(ঘ) এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব·········পরিকল্পনার উদ্বুদ্ধ করল॥

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ:

নিয়োগ, ষড়যন্ত্র, আত্মসমর্পণ, পিণ্ড, ন্যায়সঙ্গত, অন্তরীণ, নির্দেশ, সঙ্গীন, নির্ভরশীল, অনতিদূরে, সংকেত, কুচকাওয়াজ।

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: মালপত্র, গোরা সৈন্য, গুলীবর্ষণ, জলপথে, নবজাগরণ, গণদেবতা, ধর্মচেতনা, সুপরিকল্পিত, দেশপ্রেম, জনশ্রুতি, কারারুদ্ধ।

(গ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর:

মূলচ্ছেদ, বিবেকানন্দ, পুণর্গঠন, ভাবোদ্দীপক, উল্লেখ, সমানাধিকার।

(ঘ) বাক্য রচনা কর:

আন্দোলন, পরিকল্পনা, জাতীয়তাবোধ, আকাক্ষা, প্রতীক, অস্বীকার, দুর্যোগপূর্ণ।

(ঙ) পদ পরিবর্তন কর:

প্রশস্ত, সুদৃঢ়, ধর্মীয়, নির্বাসিত, সম্পূর্ণ, অনুষ্ঠিত, অসন্তোষ, নির্যাতন।

২। (ক) কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর:

(১) **সোলাপুরে** সিপাহীরা কুচকাওয়াজে যোগ দিতে অস্বীকার করল।

(২) নারী-শিশু নির্বিশেষে সকলকে **হত্যা** করা হল।

(৩) টোটা দাঁত দিয়ে কেটে **রাইফেলে** ভরতে হত।

(৪) **দিল্লী** সম্পূর্ণরূপে সিপাহীদের আয়ত্বে এসে গেল।

(৫) **জনগণের** মধ্যে নূতন চেতনার উদ্ভব হয়।

(খ) নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যগুলি রূপান্তরিত কর :

(১) বাংলার শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তিই ইংরেজদের ভারত বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে তুলল। [যৌগিক বাক্যে পরিণত কর।]

(২) ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ও মীরাটে অনুরূপ ঘটনা ঘটল।
['অনুরূপ' শব্দের কোন বিকল্প শব্দ ব্যবহার কর।]

(৩) সিপাহীদের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ল।
[বাক্যটিকে প্রশ্নবোধক বাক্যে পরিণত কর।]

(৪) তবে ইংরেজ সরকার এই আন্দোলনের মূলচ্ছেদ করার জন্য বহু ওহাবিকে নির্বাসিত করেন। [বাচ্য পরিবর্তন কর।]

৩। টীকা লিখ :

বীরষা আন্দোলন, কুকা আন্দোলন, ওহাবি আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ, হিন্দুমেলা, ভারতসভা, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন।

মৌখিক

১। (ক) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কত খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল ?

(খ) 'ভারত সভা' কাহার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেল ?

(গ) হিন্দু মেলা কি ? কত খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ?

(ঘ) আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা কত খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল ?

(ঙ) সিপাহী বিদ্রোহ কত খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল ? এই বিদ্রোহের কেন্দ্র কোথায় ছিল ?

(চ) 'কুচকাওয়াজ' কথার অর্থ কি ?

২। (ক) 'বরখাস্ত' কোন্ শ্রেণীর শব্দ ?

(খ) 'পলাশীর যুদ্ধ' কাহার কাহার মধ্যে হইয়াছিল ?

(গ) 'সুবেদার' কাহাকে বলা হয় ?

(ঘ) 'রেনাসাঁ' কথার অর্থ কি ?

(ঙ) রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বল।



রানা প্রতাপ সিংহ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[আলোচ্য নাট্যাংশে চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গলে প্রতাপসিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাঁহার নিকট কবিরাজ, রাজপুত সর্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও পুত্র অমরসিংহ উপস্থিত রহিয়াছেন। প্রতাপসিংহের বাঁচিবার আশা নাই; তাঁহার সাধের চিতোর দুর্গ পুনরুদ্ধার করিবার সংকল্প মৃত্যুশয্যায় শায়িত প্রতাপকে বার বার পীড়া দিতেছে। মৃত্যুর পূর্বে চিতোর উদ্ধার করিবার স্বপ্ন তাঁহার সার্থক হয় নাই। সেই চিতোর উদ্ধারের দায়িত্ব রাজপুত সর্দারগণের আশ্বাসে পুত্র অমরসিংহের উপর অর্পণ করিয়া রাণা প্রতাপসিংহ মানবলীলা সংবরণ করিলেন।]

[চিতোরের সন্নিহিত জঙ্গল। কাল—সন্ধ্যা। প্রতাপসিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত, সম্মুখে কবিরাজ, রাজপুত সর্দারগণ, পৃথ্বীরাজ ও অমরসিংহ।]

প্রতাপ—পৃথ্বীরাজ! এও সহিতে হল! সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী—কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ—পৃথ্বী, অপলাপ করছ কেন? ভক্তি নয় কৃপা। আমি হতভাগ্য, দুর্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট তাই আমাকে আর আক্রমণ করবেন না। শেষে মরবার আগে এও সহিতে হোল! উঃ—গোবিন্দ সিংহ!

গোবিন্দ—রাণা!

প্রতাপ—আমাকে এই শিবিরের বাহিরে একবার নিয়ে চল। মরবার আগে আমার চিতোরের দুর্গ দেখে নিই।

(গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন)

কবিরাজ—ক্ষতি কি ?

(সকলে মিলিয়া প্রতাপসিংহের পর্যঙ্ক বাহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন। ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন)

"বাঁচবার কোনো আশা নাই ?"

কবিরাজ—কোন আশা নাই।

(গোবিন্দ মস্তক অবনত করিলেন। প্রতাপ শয্যায় অর্ধোত্থিত হইয়া অদূরে চিতোর দুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন।)

প্রতাপ—"ঐ সেই চিতোর ! ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ যা' একদিন রাজপুতদের ছিল, আজ সেখানে মোগলের পতাকা উড়ছে—মনে পড়ে আজ আমার পূর্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—যিনি চিতোরের আক্রমণকারী ম্লেচ্ছকে পরাস্ত করে' তাকে গজনি পর্যন্ত বিতাড়িত করে' গজনির সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন। মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সমরসিংহের সেই ঘোর যুদ্ধ, যাতে কগোর নদের নীল বারিরাশি ম্লেচ্ছ ও রাজপুত শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীরনারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র ও তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন !—আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখছি।—ঐ সেই চিতোর ! যা উদ্ধার করব ভেবেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। কার্য প্রায় সমাধা করে এনেছিলাম ; কিন্তু তার পূর্বেই দিবা অবসান হোল। কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী—তার জন্য চিন্তা নাই প্রতাপ, সকল সময়ে কাজ একজনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কখনোও বা পিছিয়েও যায়। কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে যে সেই অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঢেউ-এর পর ঢেউ আসে, আবার দিন আসে আবার রাত্রি আসে ; এইরূপ পৃথিবীর জীবন অগ্রসর হয়। অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার ! জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান ! সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ !—কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ—চিন্তা থাকত না যদি বীর পুত্র রেখে যেতে পারতাম। কিন্তু—ওঃ—

(এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন)

গোবিন্দ—রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে ?

প্রতাপ—হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দ সিংহ। যন্ত্রণা মানসিক।—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

গোবিন্দ—কেন রাণা ?

প্রতাপ—আমার মনে হচ্ছে যে আমার পুত্র অমরসিংহ সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে।

গোবিন্দ—সে ভয়ের কোন কারণ নেই রাণা।

প্রতাপ—কারণ আছে গোবিন্দ সিংহ। অমর বিলাসী ; ও দারিদ্র্যের বিষ সে সহ্য করতে পারবে না—তাই ভয় হয় যে, আমি মরে' গেলে এ কুটীর স্থলে প্রাসাদ নির্মিত হবে, আর মেবারের পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে। আর তোমরাও সে বিলাস প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবে।

গোবিন্দ—বাপ্পার নামে অঙ্গীকার করছি তা কখনো হবে না।

প্রতাপ—তবে এখন আমি কত সুখে মরতে পারি।—(পরে অমরসিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন)—অমরসিংহ কাছে এস—আমি যাচ্ছি। শোন। যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়! কেঁদ না বৎস! আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না। আমি তোমাকে তাদের কাছে রেখে যাচ্ছি যারা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্বতে, অরণ্যে পঁচিশ বৎসর ধরে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল। তুমি যদি তাদের ত্যাগ না কর, তারা তোমাকে ত্যাগ করবে না। তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতাপ সিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।—আমি তোমাকে সমস্ত মেবার রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পারলাম না, এই দুঃখ রইল। তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্বাদ—যেন তুমি সেই

চিতোর উদ্ধার করতে পার।—আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি —(অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন) যার সম্মান, আশা করি তুমি উজ্জ্বল রাখবে। আর কি বলব পুত্র! যাও, জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও।—এই আমার আশীর্বাদ লও।

(অমরসিংহ পিতার পদধূলি লইলেন। প্রতাপসিংহ পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন, ক্ষণেক নিস্তব্ধ থামিয়া পরে কহিলেন)

জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে!—কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে—অমরসিংহ। —কোথায় তুমি!—এস—প্রাণাধিক! আরো কাছে এস।—তবে —যাই—যাই—লক্ষ্মী! এই যে আসছি!

(কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন)

রাণার মানবলীলা শেষ হয়েছে। সৎকারের আয়োজন করুন।

গোবিন্দ পুরুষোত্তম! মেবারের সূর্য!—প্রিয়তম! তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে কোথায় গেলে?

(বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। রাজপুত সর্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল।)

পৃথ্বী—যাও বীর। তোমার পুণ্যার্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল-হৃদয়ে, মানবজাতির হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকবে; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। আরাবলির প্রতি চূড়ায়, সানুদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাকবে; আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্বত, তোমার অক্ষয় স্মৃতিতে পবিত্র থাকবে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। 'রাণা প্রতাপ সিংহ' শীর্ষক নাট্যাংশটির কাহিনী নিজের ভাষায় লিখ।

২। নাট্যাংশে প্রতাপসিংহের জীবনের কোন্ সময়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে? এই সময়ে তাঁহার চরিত্রের কোন্ দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

৩। এই নাট্যাংশে রাজপুতদের যে দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা লিখ।

৪। প্রতাপসিংহ মৃত্যুর পূর্বে কি উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন? তিনি কি তাহা মৃত্যুর পূর্বে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন?

৫। প্রতাপসিংহ অন্তিম শয্যায় বসিয়া পুত্র অমরসিংহকে কি বলিয়াছিলেন তাহা বিবৃত কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) হ্যাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয় গোবিন্দ সিংহ। যন্ত্রণা মানসিক। আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে একাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে।

—এই উক্তি কে, কাহার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন? মানসিক যন্ত্রণার কারণ কি? কোন্ কাজ পিছাইয়া যাইবে বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন?

(খ) "তবে এখন আমি কত সুখে মরতে পারি।"—এই উক্তিটি কে, কখন কাহার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন? বক্তার এইরূপ উক্তি করিবার কারণ কি?

(গ) "কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।"—এই উক্তি কে, কখন এবং কাহার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন? কোন্ কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল? সেই কাজ বক্তা কি তার জীবনকালের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) মনে পড়ে পদ্মিনীর······প্রত্যক্ষবৎ দেখেছি। (খ) সকল সময়ে······নিয়ে যায়। (গ) ঢেউ-এর পর ঢেউ······কোন চিন্তা নাই। (ঘ) তারা প্রত্যেকেই প্রতাপসিংহের······প্রাণ দিতে প্রস্তুত। (ঙ) কেঁদ না বৎস······দাঁড়িয়েছিল। (চ) যাও বীর······পবিত্র থাকবে। (ছ) পুরুষোত্তম······গেল্?

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) শব্দার্থ লিখ:

হতভাগ্য, পীড়িত, দুর্বল, পর্যঙ্ক, অর্ধোত্থিত, ম্লেচ্ছ, পুণ্যার্জিত, সানুদেশ।

(খ) বাক্য রচনা কর: অক্ষয়, মানব জাতি, স্বর্ণাক্ষরে, নতজানু, সৎকার, কণ্ঠস্বর, উজ্জ্বল, যশস্বী, নিষ্কলঙ্ক, বিক্রীত, প্রবৃত্তি।

(গ) সন্ধিবিচ্ছেদ কর: উজ্জ্বল, উদ্ধার, শোকাবসন্ন, নিষ্কলঙ্ক।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : অঙ্গীকার, পুরুষোত্তম, শোকাচ্ছন্ন, মৃত্যুশয্যা, জনান্তিকে, রক্তবর্ণ, কণ্ঠস্বর, মানবলীলা।

(ঙ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর : প্রকৃতি, সৃষ্টি, উত্থান, উদ্ধার, সম্মুখ, ব্রহ্মাণ্ড।

(চ) পদ পরিবর্তন কর : নির্মিত, বিলাস, দৈহিক, মানসিক, স্পন্দন, সম্মান।

(ছ) বিপরীত শব্দ লিখ : উত্থান, সৃষ্টি, অসম্পূর্ণ, দুর্বল।

২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) এ **কাজ** আবার অনেক পিছিয়ে যাবে। (২) তবে এখন আমি কত **সুখে** মরতে পারি। (৩) **সেখানে** একদিন সকলে যায়। (৪) তারা **তোমাকে** ত্যাগ করবে না। (৫) **সৎকারের** আয়োজন কর।

(খ) নির্দেশ অনুযায়ী বাক্যগুলি রূপান্তরিত কর :

(১) রাণার মানবলীলা শেষ হয়েছে।

[বিস্ময়সূচক বাক্যে পরিণত কর।]

(২) আমি তোমাকে সমস্ত মেবার রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি।

[বাচ্য পরিবর্তন কর।]

(৩) যেখানে আমি যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়।

[একটি বাক্যে পরিণত কর।]

(৪) সে ভয়ের কোন কারণ নেই। ['নেই' শব্দটি পরিহার কর।]

(৫) শেষে মরবার আগে এও সহিতে হোল!

[বিস্ময় চিহ্ন পরিহার কর।]

মৌখিক

২। (ক) কোন্ মূল নাটক হইতে নাট্যাংশটি সংগৃহীত? (খ) নাট্যকারের নাম কি? নাট্যকারের আরও কয়েকটি নাটকের নাম কর। (গ) রাণা প্রতাপসিংহ কে ছিলেন? তিনি কোন্ কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন? (ঘ) অমরসিংহ কে ছিলেন? চিতোর কোথায় অবস্থিত? (ঙ) অমরসিংহের উপর প্রতাপসিংহের আস্থা ছিল না কেন? (চ) কিভাবে আবার অমরসিংহের উপর তাঁহার আস্থা ফিরিল?

২। (ক) 'ম্লেচ্ছ' কথার অর্থ কি? (খ) 'বাপ্পারাও' কে ছিলেন? (গ) উত্তরাধিকারী কথার অর্থ কি? (ঘ) পরিখা কথার অর্থ কি?

———

বদরীনাথের পথে • প্রবোধকুমার সান্যাল

[কল্লোলযুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল। ভ্রমণই তাঁহার সারা জীবনের কামনা বাসনা। দুর্গম হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল তিনি একাধিকবার ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'দেবতাত্মা হিমালয়'। বর্তমান পাঠ্যাংশটি তাঁহার 'মহাপ্রস্থানের পথে' নামক ভ্রমণ-উপন্যাস হইতে গৃহীত।]

পরদিন সকাল থেকেই পথ হাঁটতে শুরু। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন অপরিচিত যাত্রী চলেছে। গোপাল কুঠি পার হয়ে মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছলাম কুমারচটিতে। সমতল পথ, প্রাকৃতিক শোভায় চটিটি সমৃদ্ধ। নিকটে কর্মনাশা নদী। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, কোথাও অকারণে বেশিক্ষণ থাকতে আর ভাল লাগছে না। বরং পথে পথে বিশ্রাম নেওয়া যাবে, পথেই আমাদের যা-কিছু।

ঝড়কূলা ও সিংহদ্বার পার হয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে যেখানে এসে পৌঁছলাম, সে আমার আবাল্যের স্বপ্ন যোশীমঠ। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। আবার বেশ শীতও লাগছে। যোশীমঠ নামে এই ক্ষুদ্র শহরটির খ্যাতি, এর সংস্কৃত নাম জ্যোতির্মঠ। এখান থেকে শঙ্করাচার্যের উত্তরধাম শুরু হলো। বদরীনাথের পূজারী রাওল মহাশয়ের এখানে বাসা, শীতকালে এখান থেকেই তিনি বদরীনাথের পূজা করেন। নৃসিংহদেব প্রমুখ অনেকগুলি দেবতার মন্দির এখানে রয়েছে, সবগুলি মন্দিরই একটি চত্বরের চারিপাশে অবস্থিত। এখানে নভোগঙ্গায় স্নান অপেক্ষা দণ্ডা ধারায় স্নান প্রশস্ত। আসলে দুটিই অপরিহার্য—তাল-পুকুরে ঘটি ডোবে না। যোশীমঠ ক্ষুদ্র শহর বটে কিন্তু উখীমঠের চেয়ে

বড়। বাজার, ডাকঘর, ছাপাখানা, সদাব্রত, বসতবাটি—কী নেই? কাছেই তিব্বত ও মানস সরোবর যাবার পথ। অনেকেই এখান দিয়ে যান কৈলাস ও মানসসরোবর। মাইল তিনেক গেলে ভবিষ্যবদরী দর্শন হয়। ধর্মশালায় উঠে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই শীতের কাঁপুনি ধরলো, নিকটে পাহাড়ের চূড়ায় একটু একটু সাদা তুষার দেখা গেল। তুষার সম্বন্ধে একটা ভীতি জন্মে গেছে। যোশীমঠের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

রাত্রি শেষে শীতার্ত দেহে একাকী যোশীমঠের নিকট বিদায় নিয়ে উৎরাই পথে নামতে লাগলাম। তিন মাইল পথ নামতে হয়। পায়ের ব্যথাটা জেগে উঠলো। তিন মাইল পথ এসে নদীর পুল পার হয়ে যখন শ্রীবিষ্ণু প্রয়াগে পৌঁছলাম তখন সকাল হয়েছে। এখানে বিষ্ণুগঙ্গা বা অলকানন্দা ও ধবলীগঙ্গার সঙ্গম। পুরাকালে বিষ্ণু আরাধনা করে নারদমুনি এখানে সর্বজ্ঞ হবার বর লাভ করেছিলেন। নীলবসনা অলকানন্দার কোলে গৈরিক বসনা গঙ্গার আত্মসমর্পণ এস্থলে এক রোমাঞ্চকর নয়নাভিরাম দৃশ্য। এখান থেকে বদরীনাথ আর মাত্র ষোল-সতের মাইল পথ।

ধবলীগঙ্গার তীরে তীরে অত্যন্ত সংকীর্ণ বিপজ্জনক পথ; খানিকটা সমতল, খানিকটা বা চড়াই। খাড়া দেওয়ালের মত চড়াই নয়, ধীরে ধীরে উঠছে। কোথাও পথ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়ে নদীর মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। কোথাও কোথাও পড়েছে পাথর, তাকে অতিক্রম করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কোথাও পথ নেই, ঝরণার জলের উপর দিয়ে চলতে হচ্ছে। কোথাও স্তূপাকার বালি ও নুড়ি, অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলে এগোতে হয়। কাল থেকে মার্বেল পাথরের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, কোনোটা হাঁসের পালকের মত সাদা, কোনোটা গোলাপী, কোনোটার নীল ও হরিদ্রার সমাবেশ। দুই দিকে শ্বেত পাথর, মাঝখানে কুলুকুলু গঙ্গার প্রবাহ। অল্প অল্প চড়াই পথ ধরে কেবলই আমরা উপরের দিকে উঠে চলছি, আজকের চড়াইয়ে বুকে ব্যথা ধরে না বটে কিন্তু ক্লান্তি আসছে—পা কনকন করছে। জ্বর ছেড়ে গেছে, কিন্তু শরীর সুস্থ হয়নি। অর্ধাসন ও উপবাসে দেহ বেতস

লতার মতো দুলচে। ঘাট চটি পার হয়ে দু'মাইল চড়াই উঠে অনেক বেলায় অবসন্ন শরীরে পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামে এসে পেঁ ছিলাম।

গ্রামখানি মন্দ নয়, নদীর উপরেই। পাথরের খাদ্‌রি করা গ্রামের উঁচুনীচু পথ, ডালপালা ও গাছের গুঁড়ির তৈরী অনেকগুলি চটি, ক্ষুদ্র একটি ধর্মশালা, নিকটে যোগবদরী মন্দির। একটি ঔষধালয় পাওয়া গেল, সেখানে মুষ্টিযোগ ও টোটকা তুকতাকের কারবার। সম্মুখের পর্বতচূড়ায় পাণ্ডুরাজা বাস করিতেন, মন্দিরে তাম্রশাসন-পত্র আছে। স্থানীয় লোকেরা বোঝাতে চাইলো, এই পথ দিয়ে একদিন পঞ্চ-পাণ্ডব ও দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ করেছিলেন, কতকগুলি প্রমাণোপযোগী চিহ্ন পর্যন্ত তারা দেখিয়ে দিল। আমরা স্বর্গদ্বার অবধি যাব কিনা অনেকে প্রশ্ন করলো। শীতপ্রধান মুলুক, তাই এদিকের সাধারণ অধিবাসীরা সুশ্রী ও সুন্দর। আজকের পথের আশেপাশে বহু ভূর্জ-পত্রের গাছ, মাঝে মাঝে কোনো চটির চালাগুলি মোটা মোটা ভূর্জপত্রের তৈরী। কোথাও কোথাও রক্তরাঙা জবাফুলের মতো পাহাড়, কোনো পাহাড় উজ্জ্বল কালো রঙের, কোনোটা নীলাভ্রের মত, আবার কোনো পাহাড় দুগ্ধশুভ্র,—নির্বাক বিস্ময়ে দেখে দেখে চলে যাই।...আবার নদীর সমতল ছেড়ে উপর দিকে উঠছি, অল্প অল্প ঘিন ঘিনে চড়াই, পায়ের হাঁটু কনকন করে। কখনো দু'চারজন বদরী প্রত্যাগত প্রসন্নমুখ যাত্রীর দেখা মিলেছে। সকলের মুখেই খুশী, আনন্দ ও বদরীনাথ কীর্তন। কাঙালের মত তাদের দিকে মুখ তুলে আবার এগিয়ে যাই।

লামবগড় চটি পার হলাম। পথ আস্তে-আস্তে উপরে উঠছে, কেবলই উঠছে। এক জায়গায় এসে থামতে হলো, এমন সংকীর্ণ ও গড়ানো পথ যে বসে নামা ছাড়া উপায় নেই। বসে বসেই নীচের দিকে লাঠি গেঁথে নদীর ধারে নেমে এলাম! এপার থেকে ওপারে যেতে হবে, মাঝখানে দড়ির পুল। এই দড়ির পুল অত্যন্ত স্বদেশী, আদি ও অকৃত্রিম। এপারের পাহাড়ের সঙ্গে ওপারের পাহাড়ের পাথরে বাঁধা মোটা দু'জোড়া কাছি, সেই কাছির সঙ্গে বাঁধা কয়েকখানি তক্তা, তার উপর দিয়ে ভয়ার্ত মহাপ্রাণ হাতে নিয়ে পার হয়ে যেতে হবে।...

···ধন্যতীর্থ! অথচ এইটিই মন্দিরে যাওয়ার রাজপথ, নান্য পন্থাঃ। রোগ জরাহীন, আনন্দোজ্জ্বল, পরিচ্ছন্ন দেহে ও বলিষ্ঠ যাত্রীদের উপরে বদরীনাথের দৃষ্টি নেই; মুমূর্ষু, অকাল বার্ধক্যক্লিষ্ট, দুঃখপীড়িত দেহ, চলৎশক্তিহীন—এদের নৈলে তাঁর চলে না। এদের নিয়েই তাঁর যত মহিমা ও গৌরব। যে পথ দিয়ে তাঁর ভক্তরা আসবে সে পথে তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, মহাসঙ্কট, অকালমৃত্যু ও দুরারোগ্য ব্যাধি। আর্তের আর্তনাদই তাঁর পূজার মন্ত্র, মানুষের বাহ্য কলুষ আর মালিন্য নিয়ে তাঁর আনন্দ আয়োজন। দুঃখ, দুর্যোগ ও পীড়নের মধ্যে এসে তীর্থযাত্রী আপন আন্তরিকতার পরীক্ষা দেয়, তাই বোধ হয় তাদের শারীরিক অপরিচ্ছন্নতায় বদরীনাথের পথ ও মন্দির অপবিত্র হয় না।

হনুমান চটিতে পৌঁছে সেদিনের মত যাত্রা শেষ করলাম।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। বদরীনাথের পথে পাঠ্যাংশের বদরীনাথ যাওয়ার পথের যে বর্ণনা আছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

২। যোশীমঠের বর্ণনা কর।

৩। যোশীমঠ হইতে লামবগড় চটি পর্যন্ত রাস্তার বর্ণনা দাও।

৪। লামবগড় চটি হইতে হনুমান চটি পর্যন্ত রাস্তার বর্ণনা কর।

৫। হিমালয়ের পথে তীর্থযাত্রীদের যাওয়া আসা সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "যোশীমঠ নামে এই ক্ষুদ্র শহরটির খ্যাতি"—যোশীমঠের খ্যাতির কারণ কি? শহরটির বর্ণনা কর।

(খ) "যখন বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছলাম তখন সকাল হয়েছে।"—বিষ্ণুপ্রয়াগে কোন্ কোন্ নদীর সঙ্গম ঘটেছে? এই স্থানটির পৌরাণিক মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।

২। (ক) "অবসন্ন শরীরে পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামে এসে পৌছলাম।"—কাহার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল? এইরূপ হইবার কারণ কি? পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামের পৌরাণিক মাহাত্ম্য বর্ণনা কর। গ্রামটির বর্ণনা দাও।

(খ) "এই দড়ির পুল অত্যন্ত স্বদেশী, আদি ও অকৃত্রিম।"—এই দড়ির পুল কোথায় অবস্থিত? পুলটির বর্ণনা দাও।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

ব্যাখ্যা লিখ: (ক) রোগ জরাহীন……এদের নৈলে তাঁর চলে না।

(খ) সে পথ দিয়ে……তাঁর আনন্দ আয়োজন।

(গ) দুঃখ, দুর্যোগ……মন্দির অপবিত্র হয় না।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ: কলুষ, মালিন্য, স্বদেশী, অকৃত্রিম, ভারাক্রান্ত, অবিশ্রান্ত, আবৃত, অর্ধাশন, বেতসলতা।

(খ) বাক্য রচনা কর: আর্তনাদ, দুর্যোগ, পীড়ন, অপবিত্র, দুরারোগ্য, মহাসঙ্কট, মুলুক, সুশ্রী, ধর্মশালা, স্থানীয়।

(গ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর: স্বর্গারোহণ, ঔষধালয়, প্রমাণোপযোগী, নীলাভ্র, উজ্জ্বল, আহারান্তে, শঙ্করাচার্য, অলকানন্দা, সংস্কৃত, দুঃসাধ্য, অর্ধাশন, ভারাক্রান্ত।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর: ধর্মশালা, মুষ্টিযোগ, স্তূপাকার, আত্মসমর্পণ, গৈরিক বসনা, অকাল-বার্ধক্যক্লিষ্ট, দুঃখপীড়িত দেহ, চলৎ শক্তিহীন, আনন্দোজ্জ্বল।

(ঙ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর:
বিষ্ণু, পাণ্ডব, সর্বজ্ঞ, সমৃদ্ধ, প্রশস্ত, ক্লান্তি।

(চ) পদ পরিবর্তন কর: অকৃত্রিম, সংকীর্ণ, চিহ্ন, অত্যন্ত, অপেক্ষা, অল্প, অবস্থিত, অব্যবহার্য, ভীতি, সঙ্গ, স্থানীয়।

(ছ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:
চড়াই, সুশ্রী, সমতল, কম্পিত, দুঃখ, দুর্যোগ, অপরিচ্ছন্ন, অকাল।

২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর:
১। চটির চালাগুলি **ভূর্জপত্রের** তৈরি। ২। লামবগড় **চটি** পার হলাম। ৩। **নিকটে** কর্মনাশা নদী। ৪। **তুষার** সম্বন্ধে একটা ভীতি জন্মে গেছে। ৫। আবার বেশ **শীত** লাগছে।

(খ) নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত কর :

১। তিন মাইল পথ নামতে হয়, পায়ের ব্যথাটা জেগে উঠলো।
[সরল বাক্যে পরিণত কর।]

২। সে আমার আবাল্যের স্বপ্ন যোশীমঠ।
[জটিল বাক্যে পরিণত কর।]

৩। জ্বর ছেড়ে গেছে, কিন্তু শরীর সুস্থ হয় নি।
['না' সূচক বাক্যটি পরিহার কর।]

৪। গ্রামখানি মন্দ নয়, নদীর উপরেই।
[যৌগিক বাক্যে পরিণত কর।]

৫। কাল থেকে মার্বেল পাথরের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি।
[বাচ্য পরিবর্তন কর।]

(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :

শীতপ্রধান মুলুক, তাই এদিকের সাধারণ অধিবাসীরা সুশ্রী ও সুন্দর। আজকের পথের আশেপাশে বহু ভূর্জপত্রের গাছ, মাঝে মাঝে কোনো চটির চালাগুলি মোটা মোটা ভূর্জপত্রের তৈরি। কোথাও কোথাও রক্তরাঙা জবাফুলের মতো পাহাড়, কোনো পাহাড় উজ্জ্বল কালো রঙের, কোনোটা নীলাভ্রের মত, আবার কোনো পাহাড় দুগ্ধশুভ্র, নির্বাক বিস্ময়ে দেখে দেখে চলে যাই।

মৌখিক

১। (ক) ভ্রমণ কাহিনীটি কোন্ লেখকের কোন্ পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে? (খ) বদরীনাথ কে? এই তীর্থস্থান কোথায় অবস্থিত? (গ) 'চটি' বলিতে কি বুঝ? কি প্রয়োজনে লাগে? (ঘ) ভূর্জপত্র কি? ইহার কি প্রয়োজন হয়? (ঙ) 'দড়ির পুল' দেখিতে কেমন? কোন্ অঞ্চলে ইহা দেখা যায়? (চ) যোশীমঠের সংস্কৃত নাম কি? যোশীমঠে কি কি আছে? (ছ) পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামের বৈশিষ্ট্য কি? (জ) বিষ্ণুপ্রয়াগের বৈশিষ্ট্য কি? এখানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা কর।

২। (ক) 'সদাব্রত' শব্দের অর্থ কি? 'খাদ্‌রি' বলিতে কি বুঝ? (খ) 'মার্বেল পাথর' বলিতে কি বুঝ? ইহা কি কাজে লাগে? লেখক কোথায় ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন? (গ) কুমারচটির পাশে কোন্ নদী প্রবাহিত? (ঘ) বদরীনাথের পূজারীর নাম কি ছিল? শীতকালে তিনি কোন্ স্থান হইতে বদরীনাথের পূজা করিতেন? এইরূপ করিবার কারণ কি?



রামের বনবাস যাত্রা • কৃত্তিবাস ওঝা

[কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা পয়ার ছন্দে সংস্কৃত বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করিয়া বাঙালীর হৃদয়রাজ্যে অক্ষয় আসন লাভ করিয়াছেন। বর্তমান অংশটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত। রাম বনবাস যাত্রাকালে প্রথমে সীতাকে সঙ্গে লইতে চাহেন নাই। কিন্তু সীতা সমস্ত দুঃখ বরণ করিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গী হইতে চাহিলেন।]

বিদায় লইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা সম্ভাষণে॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ কর্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ॥
চতুর্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি দিনে॥
জানকী বলেন সুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি যে পরমগুরু তুমি যে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব করে লও দাসী॥

শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন।
তোমায় পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥
বনে বাস হেতুই হয়েছে তব মন।
খসাইয়া ফেলহ গায়ের আভরণ ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
খুলিলেন অলঙ্কার যা ছিল শরীরে ॥
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
তা সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ ॥
সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু রত্ন ধন ॥
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ ॥

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। রাম সীতার নিকট কি বলিয়া বিদায় লইতে চাহিলেন? সীতা কি যুক্তি দেখাইয়া রামের সহিত বনবাসে যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন?

২। বনবাস যাত্রার পূর্বে রাম কেন সীতার গায়ের আভরণ খুলিবার নির্দেশ দিলেন?

৩। বনবাস যাইবার আগে সীতা কি করিলেন তাহা নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে।"

—এই উক্তি কে কাহার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন? 'বিমাতা'র নাম কি? তাঁহার 'বাক্যে' বনবাস যাইবার কারণ কি? বনবাস যাইবার প্রাক্কালে তিনি সীতাকে কি বলিয়াছিলেন?

(খ) "পথের দোসর হব করে লও দাসী।"

—এই উক্তি কে কখন, কাহার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন? কোন্ কোন্ যুক্তির মাধ্যমে সীতা রামের নিকট বনবাস-সঙ্গী হইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন?

(গ) "তোমায় পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ।"
—কে কাহাকে, কিভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন ?

(ঘ) "সীতার ভাণ্ডারে ছিল বহু রত্ন ধন।
সে সকল করিলেন তিনি বিতরণ ॥"
—সীতা তাঁর ভাণ্ডারের রত্ন ধন বিতরণ করিলেন কেন ?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা কর : (ক) চতুর্দশ বর্ষ আমি……রাত্রি দিনে।
(খ) স্বামী বিনা……মরণে সংহতি ॥
(গ) সম্মুখে দেখেন যত……তিনি বিতরণ ॥

২। টীকা লিখ : সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, বিমাতা, ভরত।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) গদ্যরূপ লিখ :
আশ, এতেক, ফেলহ, হরিষ, খসাইয়া।

(খ) অর্থ লিখ :
আভরণ, সজ্জন, সংহতি, দোসর, নিরাশ, হরিষ, গৃহবাস, বিমাতা।

(গ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :
সজ্জন, সংহতি, নিরাশ, চতুর্দশ, পরীক্ষা।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :
পরমগুরু, বনবাসী, কর্মদোষে, বনবাস, বাসগৃহ।

(ঙ) বাক্য রচনা কর :
সজ্জন, বিতরণ, সংহতি, নিরাশ, তাবৎ, আভরণ, এতক্ষণ।

২। (ক) বিপরীত শব্দ লিখ :
বিতরণ, দোসর, সংহতি, নিরাশ, আশ, হরিষ।

(খ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর :
জানকী, লক্ষ্মণ, পরীক্ষা, ব্রাহ্মণ।

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির দুইটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ :
আভরণ, হরিষ, সজ্জন।

৩। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) **বিমাতার** বাক্যে আমি যাই **বনবাসে**।

(২) তাবৎ মায়ের সেবা কর **রাত্রি দিনে**।

(৩) **স্বামী বিনা** স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।

(৪) তোমায় পরীক্ষা করিলাম **এতক্ষণ**।

(৫) বিদায় লইয়া রাম মায়ের **চরণে**।

(খ) পাঠ্যাংশ হইতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

তুমি যে — তুমি যে —।
তুমি — যথা — আমি যাই তথা।
— বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি —।
স্বামীর জীবনে — মরণে —।

মৌখিক

১। (ক) 'রামের বনবাস যাত্রা'—কোন্ মহাকাব্যের অংশ? এই কাব্যের কবির নাম লিখ।

(খ) কৃত্তিবাস সংস্কৃত কোন্ রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন?

(গ) রাম কত বৎসর বনে গিয়াছিলেন? বনবাস যাইবার কারণ কি?

(ঘ) রামের সহিত আর কে কে বনবাসে গিয়াছিলেন?

(ঙ) সীতা বনবাস যাইবার আগে সব ধনরত্ন কাহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন?

২। (ক) "তুমি যে পরমগুরু তুমি যে দেবতা"—এইরূপ কথা বলিবার কারণ কি?

(খ) শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে কিভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন? এইরূপ পরীক্ষা করিবার কারণ কি?

———



ভীষ্মের শরশয্যা • কাশীরাম দাস

[কাশীরাম দাস সংস্কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। বর্তমান কবিতাটি কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে সঙ্কলিত। ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণ এবং কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রতি তাঁহার উপদেশ বর্তমান কবিতার বিষয়বস্তু।]

হাসিয়া অর্জুন হাতে লইলেন ধনু।
পঞ্চবিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেন তনু॥
অর্জুনের বাণ সব অগ্নিসম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্রসম ফুটে॥
গঙ্গার নন্দন বিচারেণ মনে মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন॥
বাণাঘাতে মহাবীর হয়ে হীনবল।
রথের উপর হতে পড়ে ভূমিতল॥
শিয়র করিয়া পূর্বে পড়িল সে বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির॥
ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেন শয্যা নিল এবে ভীষ্ম বীরবর॥
দুর্যোধন মহারাজ শোকাকুল হয়ে।
রথ ত্যাজি তাড়াতাড়ি আইলেন ধেয়ে॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্যোধন।
উঠে পিতামহ পার্থ সহ কর রণ॥
আমার আছিল বড় সাধ মনে মনে।
পাণ্ডবে জিনিয়া সব পাব রাজ্যধনে॥

তার বিপরীত হেন বিধাতা করিল।
সুমেরু পর্বত যেন শৃগাল লঙ্ঘিল॥
রথ হতে নামি তবে ধর্মের নন্দন।
ভীষ্ম দেখিবারে যান সহ জনার্দন॥
শরশয্যা 'পরে যথা ভীষ্ম মহাবীর।
প্রণাম করিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির॥
অহে পিতামহ তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্যাদা সাগর॥
ধিক্ ক্ষাত্রধর্ম মায়ামোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহকে যে মারিলাম শরে॥
মধুর কোমল স্বর প্রসন্ন গভীর।
কহিতে লাগিল ভীষ্ম চাহি যুধিষ্ঠির॥
বৎস এ দক্ষিণায়ন আছে যতদিন।
ততদিন শরীর না হবে প্রভাহীন॥
তেজ পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর ছাড়িয়া আমি প্রাণ মাত্র ধরি॥
দুর্যোধন চাহি পুনঃ কহয়ে বচন।
পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ॥
ভাই-ভাই বিবাদ না করে কদাচিৎ।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করত সম্প্রীত॥
দুর্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সুচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে॥
শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে।
দৈব যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। ভীষ্ম শরশয্যায় দুর্যোধনকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন ?

২। যুধিষ্ঠির কি বলিয়া শোক করিলেন ?

৩। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কি বলিয়াছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) ভূমি নাহি স্পর্শে অঙ্গ শরের উপর।
হেন শয্যা নিল এবে ভীষ্ম বীরবর ॥

—ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন ? কাহার বাণে তাঁহাকে শরশয্যা গ্রহণ করিতে হয় ? দুর্যোধন শোকাকুল হইয়া কি বলিয়াছিলেন ?

(খ) তার বিপরীত হেন বিধাতা করিল।
সুমেরু পর্বত যেন শৃগাল লঙ্ঘিল ॥

—এই উক্তি কে, কাহার উদ্দেশ্যে কখন করিয়াছিলেন ? এইরূপ বলিবার কারণ কি ?

(গ) দুর্যোধন বলে মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে ॥

—এই উক্তি কে, কাহার উদ্দেশ্যে কখন করিয়াছিলেন ? এইরূপ বলিবার কারণ কি ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ : (ক) ভূমি নাহি……ভীষ্ম বীরবর ॥
(খ) আমার আছিল……শৃগাল লঙ্ঘিল ॥
(গ) তেজ পরাক্রম যত……প্রাণমাত্র ধরি ॥
(ঘ) দুর্যোধন বলে……পাণ্ডবেরে ॥

২। টীকা লিখ : শিখণ্ডী, ভীষ্ম, দুর্যোধন, সুমেরু পর্বত, জনার্দন, দক্ষিণায়ণ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) গদ্যরূপ লিখ :
বিন্ধিলেন, কান্দে, বিচারেণ, খসিল, ত্যাজি, জিনিয়া, কহয়ে।

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :
অগ্নিসম, বজ্রসম, মহাবীর, হীনবল, ভূমিতল, শোকাকুল, ধর্মের নন্দন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, প্রভাহীন, পরাক্রম।

(গ) অর্থ লিখ :
হীনবল, বজ্রসম, প্রভাহীন, পরাক্রম, জিতেন্দ্রিয়, পরিহরি, সূচ্যগ্র, শিয়র।

(ঘ) বাক্য রচনা কর :

সম্প্রীত, কদাচিৎ, প্রসন্ন, শোকাকুল, মিহির, কোমল।

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির **তিনটি** করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ :

মিহির, নন্দন, বীর, আকাশ।

২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) ভীষ্মের **শরীরে** যেন বজ্রসম ফুটে।

(২) **বাণাঘাতে** মহাবীর হয়ে হীনবল।

(৩) **রথের উপর** হতে পড়ে ভূমিতল।

(৪) **পাণ্ডবে** জিনিয়া সব পাব রাজ্যধনে।

(৫) **দুর্যোধন** চাহি পুনঃ কহয়ে বচন।

(খ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর :

স্পর্শ, ভীষ্ম, ভূমি, নন্দন, পাণ্ডব, সম্প্রীত।

(গ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

সূচ্যগ্র, দক্ষিণায়ন, শোকাকুল, বাণাঘাতে।

৩। উপযুক্ত (পাঠ্য পুস্তকের) শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

মধুর — স্বর — গভীর।
কহিতে লাগিল — চাহি —॥
বৎস এ — আছে —।
— শরীর না হবে —॥

মৌখিক

১। কবিতাটির প্রথম আট লাইন আবৃত্তি কর।

২। (ক) কবিতাটি কোন্ কাব্য হইতে সংগৃহীত ?

(খ) ভীষ্ম কেন শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

(গ) কোন্ যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

(ঘ) দক্ষিণায়ন বলিতে কি বুঝ ? ভীষ্ম দক্ষিণায়ন থাকিতে মৃত্যুবরণ না করিবার কারণ কি ?

৩। (ক) 'সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্যাদা সাগর'—লাইনটির সরল অর্থ লিখ।

(খ) "দৈব যাহা করে তাহা কে খণ্ডিতে পারে।"—এই উক্তি কাহার ? দৈব বলিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন ?



পূজারিণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কবিতাটি তাঁহার 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। কবিতাটি শ্রীমতী নামে এক বুদ্ধের দাসীর করুণ পরিণতির কথা বলা হইয়াছে।]

নৃপতি বিম্বিসার।
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
পাদনখকণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে,
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ—
শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি'
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপ-পাদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনক-প্রদীপমালা।
অজাতশত্রু রাজা হল যবে,
পিতার আসনে বসি',
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে

সঁপিল যজ্ঞ-অনল আলোতে
বৌদ্ধ-শাস্ত্ররাশি।

কহিল ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,—
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার ;—
ভুলিলে বিপদে হবে"

সেদিন শারদ দিবা অবসান,—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি'।

শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা
"এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে!"
সেথা হ'তে ফিরি' গেল চলি' ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সম্মুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সীমন্ত-সীমা-'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি' গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত,—
কহিল,—"অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা, এমনি যা চলে'
কে কথা দেখিবে, ঘটিবে তা হ'লে
বিষম বিপৎপাত।"

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি' একাকিনী,
পড়িতে নিরত কাব্য কাহিনী,
চমকি' উঠিল শুনি কিঙ্কিণী
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি, পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমনি ক'রে কি মরণের পানে,
ছুটিয়া চলিতে আছে?"

দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্য-থালি।
"হে পুরবাসিনী!"-সবে ডাকি কয়,
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়"—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলাল'
নগর-সৌধ 'পরে
পথ জনহীন আঁধার বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ,
আরতি-ঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজ-দেবালয় ঘরে।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
অগণ্য তারা জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান"
—দ্বারী ফুকারিরা বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার কানন বিজন মাঝারে
স্তূপ-পদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মত!

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনই ছুটিয়া আসি'
শুধাল',—"কে তুই ওরে দুর্মতি
মরিবার তরে করিস্ আরতি?"
মধুর কণ্ঠে শুনিল—"শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।"

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে
পড়িল রক্ত-লিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপ-পাদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ-আরতির শিখা!

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। পূজারিণী কবিতার সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

২। শ্রীমতীর জীবনের করুণ পরিণতির কারণ কি?

৩। বিম্বিসার কে ছিলেন? তিনি বুদ্ধের নিকট হইতে কি চাহিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার উপর কি নির্মাণ করিয়াছিলেন? সন্ধ্যাবেলায় সেখানে রাজবধূ ও রাজবালা কি কি করিতেন?

৪। অজাতশত্রু রাজা হইয়া কি আদেশ জারি করিয়াছিলেন?

৫। শ্রীমতী পূজার অর্ঘ্য লইয়া কাহার কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাহাকে কি বলিয়াছিলেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি' গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত,—।"

—শ্রীমতী কে? তাহাকে দেখিয়া কাহার হাত কাঁপিয়া গেল? তিনি তখন কি করিতেছিলেন? তাহার এইরূপ হইবার কারণ কি?

(খ) "শ্রীমতীরে হেরি, পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।"

—শ্রীমতীকে দেখিয়া কে পুঁথি মাটিতে রাখিয়াছিলেন? দ্রুত পদে তাহার নিকট ছুটিয়া যাইবার কারণ কি? তিনি তখন কি কাজ করিতেছিলেন?

(গ) "এমন সময় হেরিলা চমকি'—
প্রাসাদে প্রহরী যত—।"
—কে কাহাকে, কোথায় দেখিল ? তাহাদের চমকিত হইবার কারণ কি ? তাহাদের উপর রাজার কি আদেশ ছিল ? তাহার সে আদেশ কিভাবে পালন করিল ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া……ভুলিলে বিপদ হবে।

(খ) পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে……বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশি।

(গ) সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে……শেষ-আরতির শিখা।

২। টীকা লিখ :

বিম্বিসার, স্তূপ, অজাতশত্রু, বেদ, দ্বারী।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ বল :

পাদনখকণা, শিলাময় স্তূপ, অর্ঘ্যরচনা, মুক্ত কৃপাণ, পুররক্ষক, সিংহদুয়ার, সৌধ, কিঙ্কিণী, চিকুর।

(খ) পদ পরিবর্তন কর :

গহন, যজ্ঞ, পূজা, শীতল, নীরব, নির্বাসন, প্রাচীন।

(গ) গদ্যরূপ লিখ :

হেরিলা, হেরি, ভূমে, বসি, নমিয়া, স্থাপিয়া, যতনে, সাজায়ে।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :

কনক প্রদীপমালা, মুক্ত কৃপাণ, পুররক্ষক, দুর্মতি, সিংহদুয়ার, মন্ত্রণাসভা, কল কোলাহল, জনহীন।

(ঙ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

দুর্মতি, সীমন্ত, নীরব।

(চ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর :

ব্রাহ্মণ, পুণ্য, স্বচ্ছ, মুক্ত, বুদ্ধ, ক্ষীণ, প্রাচীন।

(ছ) বিপরীত শব্দ লিখ :

বিজন, বিষম, দীর্ঘ, শীতল, শুভ্র, নীরব, নিভৃতে।

(ঞ) লিঙ্গ পরিবর্তন কর :
একাকিনী, ক্ষীণ, শারদ।

২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) **শ্রীমতীরে** হেরি বাঁকি' গেল রেখা।

(খ) আপনার **হাতে** দিতেন জ্বালায়ে
কনক প্রদীপমালা।

(গ) চাহিয়া দেখিল **দ্বারে**।

(ঘ) **রাজার আদেশ** আজি কে না জানে ?

(ঙ) সেদিন শুভ্র পাষাণ **ফলকে**
পড়িল রক্ত-লিখা।

৩। পাঠ্যাংশ হইতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

শারদ নিশির — তিমিরে
— তারা জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল —,
— ধরে সন্ধ্যার —,
— হ'ল সমাধান,
দ্বারী — বলে।

মৌখিক

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। (ক) বিম্বিসার কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ?

(খ) বিম্বিসার কিভাবে শিলাময় স্তূপ রচনা করিয়াছিলেন ?

(গ) 'পূজারিণী' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ কর।

(ঘ) 'অজাতশত্রু করেছে রটনা'—অজাতশত্রু কি রটনা করিয়াছিলেন ?

(ঙ) "শূল" শব্দটির অর্থ কি ? ইহা কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় ?

(চ) "কে তুই ওরে দুর্মতি"—একথা কে কাহাকে বলিয়াছিল ?

৩। (ক) আরতী কখন হয় ?

(খ) পুরবাসী কাহাদের বলে ?

———



পরাজিত সমুদ্র • মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ছাত্রাবস্থায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার 'মেঘনাদ বধ', তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' ও চতুর্দশ পদাবলী' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বর্তমান অংশটি তাঁহার মেঘনাদ বধ কাব্য হইতে সঙ্কলিত।]

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্ ওহে জল-দল পতি
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ দেব শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি প্রভঞ্জন সম
ভীম পরাক্রমে! কহ এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তা'রে লয়ে
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বু-স্বামি,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙ্গি'।

দূর কর অপবাদ, জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ-কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। 'প্রচেতঃ' কথার অর্থ কি? কোন্ মালার কথা এখানে বলা হইয়াছে? কেন কবি সমুদ্রকে ধিক্কার দিয়াছেন? সমুদ্রকে এইরূপ বলিবার কারণ কি?

২। সমুদ্রের নিকট কে, কি মিনতি করিতেছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৩। কোন্ মূলকাব্য হইতে অংশটি গৃহীত হইয়াছে? কবির সমুদ্রের প্রতি এইরূপ উক্তি করিবার কারণ কি? সমুদ্র কি সত্য-সত্যই পরাজিত হইয়াছে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) হা-ধিক্ ওহে জল-দল পতি
এই কি সাজে তোমারে—
—কে, কাহার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিয়াছেন? এইরূপ বলিবার কারণ কি?

(খ) কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
—কাহার প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে? নির্দয় বলিবার কারণ কি?

(গ) রেখো না গো তব ভালে এ-কলঙ্ক রেখা।
—কোন্ 'কলঙ্ক রেখা'র কথা বলা হইয়াছে? 'কলঙ্ক রেখা' বলিবার কারণ কি?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) হা ধিক্………তোমারে?

(খ) কহ এ নিগড়………বীতংসে?

(গ) দূর কর অপবাদ………এ মম মিনতি।

২। হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ দেব শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?

—কোন্ কবিতার অংশ ? 'রত্নাকর' কাহাকে বলা হইয়াছে ? দাশরথি কে ? তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করিবার কারণ কি ? উদ্ধৃত অংশটির ব্যাখ্যা লিখ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ :

প্রচেতঃ, রত্নাকর, প্রভঞ্জন, পরাক্রম, নিগড়, বীভৎস, জাঙ্গাল, বারীন্দ্র।

(খ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

বারীন্দ্র, রত্নাকর, নির্দয়, নিলাম্বু।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ :

জল-দল-পতি, অজেয়, রত্নাকর, নীলাম্বু-স্বামী, হৈমবতী, কলঙ্ক-রেখা, বারীন্দ্র।

(ঘ) বাক্য রচনা কর :

রিপু, জালা, অপবাদ, নির্দয়, পরাক্রম, ভূষণ, অলঙ্ঘ্য, প্রভঞ্জন।

(ঙ) গদ্যরূপ লিখ :

গলে, সম, শোভে, এবে, ভাঙ্গি, তব, মম, শৃঙ্খলিয়া।

(চ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর :

দাশরথি, অলঙ্ঘ্য, নীলাম্বু।

২। (ক) বিপরীত শব্দ লিখ :

কলঙ্ক, প্রবল, অতল, অপবাদ, ভাঙ্গি, নির্দয়।

(খ) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ **গলে**,
(খ) এই কি সাজে **তোমারে**,
(গ) কোন্ **গুণে**, কহ দেব শুনি,
(ঘ) কহ এ **নিগড়** তবে পর তুমি কোন্ পাপে ?
(ঙ) হে **বারীন্দ্র**, তব পদে এ মম মিনতি।

(গ) উপযুক্ত শব্দ (পাঠ্যাংশ হইতে) ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) কহ এ — তবে
পর তুমি কোন্ — ? অধম —
— যাদুকর, খেলে তা'রে —
— রাজপদ কার সাধ্য —
বীতংসে ?

(২) দূর কর — , জুড়াও এ — ,
— অতল জলে এ — রিপু।
রেখো না গো তব — এ — ,
হে — , তব পদে এ মম — ।

মৌখিক

১। (ক) কবিতাটি কোন্ কাব্যগ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে ? .কবির আরও কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের নাম বল। কবির নাম কি ?

(খ) কবির নামের আরম্ভে 'মাইকেল' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে কেন বল।

(গ) 'প্রচেতঃ' শব্দের অর্থ কি ?

(ঘ) যাদুকর কাহাকে বলে ? তাহার কাজ কি ? এখানে কি প্রসঙ্গে যাদুকরের অবতারণা করা হইয়াছে ?

(ঙ) 'বীতংস' শব্দের অর্থ কি ?

(চ) 'লঙ্কাপুরী'র বর্ণনা কবি কিভাবে দিয়াছেন ?

২। (ক) 'কৌস্তভ রতন যথা মাধবের বুকে'—লাইনটির অর্থ বল এবং প্রসঙ্গ উল্লেখ কর।

(খ) 'জাঙ্গাল' শব্দের অর্থ কি ?



জাতির পাঁতি • সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হয়; তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন। তিনি রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহভাজন ছিলেন। বাংলা কাব্যে তিনি নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাই তাঁহাকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়। 'বেণু-বীণা', 'কুহু কেকা', 'অভ্র আবীর', 'হোম শিখা' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ।]

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে,
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবিশশী মোদের সাথী।

শীতাতপ ক্ষুধা, তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি-কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি,
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।

দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙ্গা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল,
ভিতরে সবারি সমান রাঙ্গা।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন-শূদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র,
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে!

রাগে অনুরাগে নিদ্রিতে জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ,
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। 'জাতির পাঁতি' কবিতাটির মর্মার্থ লিপিবদ্ধ কর।

২। কবি কোন্ জাতির কথা এখানে বলিয়াছেন? তাঁহার এইরূপ বলিবার কারণ কি?

৩। 'জাতির পাঁতি' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া লিখ।

৪। 'জাতির পাঁতি' কথার অর্থ কি? কবি এই কবিতার মধ্য দিয়া মানব সমাজকে কোন্ বিষয়ে অবহিত হইতে বলিয়াছেন তাহা আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে।'
—কোন্ কবিতার লাইন? কবির নাম কি? কোন্ জাতির কথা বলা হইয়াছে? এইরূপ বলিবার কারণ কি?

(খ) 'কচি-কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি,
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।'
—কোন্ কবিতার লাইন? কবির নাম কি? 'কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি' বলিবার কারণ কি? 'বাঁচিবার তরে সমান যুঝি'—বলিতে কি বুঝ?

(গ) 'রাগে অনুরাগে নিদ্রিতে জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়।'
—কোন্ কবিতার লাইন? কবি কে? আসল মনুষ্যত্বের বিকাশ কিভাবে হয় তাহা উল্লেখ কর।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। (ক) কালো আর ধলো বাহিরে কেবল,
ভিতরে সবারি সমান রাঙ্গা।
—কবিতার লাইন দুইটি কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত? কবির নাম কি? লাইন দুইটির ব্যাখ্যা লিখ।

(খ) ব্যাখ্যা লিখ:

(১) শীতাতপ ক্ষুধা.........সমান বুঝি।

(২) বাহিরের ছোপ.........ধূলায় লোটে।

(৩) রাগে অনুরাগে.........জগৎ ব্রহ্মময়।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ:

শীতাতপ, বাসর, দোসর, ডাঁটো, ছোপ, পলকে, কৃত্রিম, প্রকট, ব্রহ্মময়।

(খ) বাক্য রচনা কর:

নিখিল, অনুরাগে, ভেদ, ডাঙ্গা, লালিত।

(গ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর:

লালিত, নিদ্রিত, অনুরাগ, লোপ, প্রকট।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ:

রবিশশী, শীতাতপ, বামুনশূদ্র, কচি কাঁচা, বৃহৎ-ক্ষুদ্র।

(ঙ) প্রত্যেকটি শব্দের দুইটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ:

বর্ণ, বাসর, রাগ, লালিত, বুঝি।

(চ) বিপরীত শব্দ লিখ:

কৃত্রিম, নিদ্রিত, বৃহৎ, রাঙ্গা, ডাঙ্গা।

২। টীকা লিখ:

(ক) নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়; এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত; কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে; একই রবিশশী মোদের সাথী।

(খ) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর:

(১) এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত।

(২) বাঁচিবার তরে সমান বুঝি।

(৩) **রাগে** অনুরাগে নিদ্রিতে জাগে।

(৪) আসল **মানুষ** প্রকট হয়।

(৫) **ভিতরে** সবারি সমান রাঙ্গা।

৩। পাঠ্যাংশ হইতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান **পূরণ কর :**

(ক) জগৎ — এক জাতি —
সে জাতির নাম — —
এক — স্তন্যে লালিত
একই — মোদের —

(খ) দোসর — ও — বাঁধি গো,
জলে —, বাঁচি — ডাঙ্গা,
কালো আর — বাহিরে —
— সবারি — রাঙ্গা।

মৌখিক

১। (ক) কবিতাটির কবির নাম বল এবং তাঁহার কয়েকটি কাব্য গ্রন্থের নাম বল।

(খ) 'ছন্দের যাদুকর' কোন্ কবিকে বলা হয় ?

(গ) 'দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি'—অর্থ বল।

(ঘ) 'ভিতরের রং পলকে ফোটে'—এই লাইনটির অর্থ বল।

(ঙ) 'কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে'—কিভাবে তাহা সম্ভব হয় আলোচনা কর।

(চ) কি জিনিসের জন্য আমরা সবাই সমান যুঝি ?

(ছ) 'মানুষ জাতি' বলিতে কি বুঝ ?

২। (ক) সত্যেন্দ্রনাথদত্তের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ বল।

(খ) 'ব্রহ্মময়' শব্দের অর্থ বল।



শচির আক্ষেপ • হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[বৃত্রাসুর কর্তৃক স্বর্গ রাজ্য অধিকৃত হইবার পর ইন্দ্রপত্নী শচী মর্ত্যলোকের নৈমিষারণ্যে নির্বাসিতা হইয়াছিলেন। তাই শচী তাঁহার সখী চপলার নিকট আক্ষেপ জানাইয়াছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপদী ছন্দে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।]

"কেমনে ভুলিব বল্ মেঘে যাবে আখণ্ডল
বসিত কার্মুক ধরি করে,
তুই সে মেঘের অঙ্গে খেলিতিস্ কত রঙ্গে
ঘটা করি লহরে লহরে।
কি শোভা হইত তবে বসিতাম কি গৌরবে
পার্শ্বে তাঁর নীরদ আসনে!
হ'ত কিবা ঘন ঘন মৃদু মন্দ গরজন
মেঘ যবে দুলাত পবনে?
ইন্দ্রের সে মুখকান্তি ঘুচায়ে নয়নভ্রান্তি
কতদিন সখিরে না হেরি,
কত দিন বৈসে নাই ঘুচায়ে চক্ষু-বালাই
সুরবৃন্দ বাসবেরে ঘেরি।
সুমেরু-শিখরে সুখে খেলিতাম সবে
অমর সঙ্গিনীগণ সহ,
উপরে অনন্ত শূন্য অনন্তনক্ষত্রপূর্ণ',
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।
ভ্রমিত নির্মল বায়, ফুটিয়া ফুটিয়া তায়
কত পুষ্প সুমেরু শোভিত,

নির্মল কিরণ শোভা, সখিরে কি মনোলোভা
মরু-অঙ্গে নিত্য বরষিত।
সখি সেই মন্দাকিনী চিরানন্দ-প্রদায়িনী
দেবের পরশ সুখকর।
চলেছে নন্দনতলে, উছলি মধুর জলে,
ভাবিতে রে হৃদয় কাতর!
কার ভোগ্যা এবে তাহা কার ভোগ্য এবে আহা
আমার সে নন্দন-বিপিন!
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবা সে আঘ্রাণ পায়,
পারিজাত কে করে মলিন।"

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। কবিতাটির বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

২। শচীর আক্ষেপ করিবার কারণ কি? কাহার নিকট তিনি আক্ষেপ করিতেছেন? তিনি কি কি বিষয়ে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিখ।

৩। শচী কে? কোন্ কাব্য হইতে এই অংশটি গ্রহণ করা হইয়াছে? শচীর স্বামীর নাম কি? তিনি কাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) ইন্দ্রের সে মুখকান্তি ঘুচায়ে নয়নভ্রান্তি
কত দিন সখিরে না হেরি—

—কে কাহার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিয়াছেন? 'ইন্দ্রকে' না দেখিতে পাইবার কারণ কি?

(খ) উপরে অনন্ত শূন্য অনন্ত নক্ষত্র পূর্ণ
সদা স্নিগ্ধ সদা গন্ধবহ।

—কাহার উক্তি? কোন্ স্থানের বর্ণনা? কখন কাহার নিকট এই বর্ণনা করিয়াছেন?

(গ) কার ভোগ্য এবে তাহা কার ভোগ্য এবে আহা,
আমার সে নন্দন-বিপিন!

—কে, কাহাকে এই কথা বলিয়াছেন? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে? এইরূপ বলিবার কারণ কি?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) সখি সেই ··· ··· সুখকর।

(খ) কার ভোগ্য ··· ··· নন্দন-বিপিন!

২। সখি সেই মন্দাকিনী চিরানন্দ-প্রদায়িনী
দেবের পরশ সুখকর।

—কোন্ কবিতা হইতে লাইনগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে? কোন্ প্রসঙ্গে কে ইহা কাহাকে বলিয়াছেন? লাইনগুলির ব্যাখ্যা লিখ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ:

আখণ্ডল, কার্মুক, লহরে, নয়নভ্রান্তি, সুরবৃন্দ, নন্দন-বিপিন, পারিজাত।

(খ) গদ্যরূপ লিখ:

উছলি, ভ্রমিছে, বরষিত, ধরি, বৈসে, লহয়ে।

(গ) বাক্য রচনা কর:

আঘ্রাণ, মনোলোভা, স্নিগ্ধ, গন্ধবহ, বালাই, সুমেরু, নীরদ।

(ঘ) প্রকৃতি প্রত্যয় নির্ণয় কর:

স্নিগ্ধ, আঘ্রাণ, ভোগ্য।

(ঙ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির দুইটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ:

নীরদ, আখণ্ডল, কার্মুক, সুমেরু, অনন্ত, মধুর।

(চ) বিপরীত শব্দ লিখ:

মধুর, মলিন, মন্দ, মৃদু, ভ্রান্তি, শিখর।

(ছ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর:

মুখকান্তি, নীরদ, নয়নভ্রান্তি, সুরবৃন্দ, সুমেরু শিখরে, সঙ্গিনী-সহ, গন্ধবহ, মরু অঙ্গে, চিরানন্দ প্রদায়িনী, নন্দন-বিপিন।

২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) ভাবিতে রে **হৃদয়** কাতর !

(খ) **সুখে** খেলিতাম সবে।

(গ) সুরবৃন্দ **বাসবেরে** ঘেরি।

(ঘ) **মেঘ** যবে দুলাত পবনে ?

(ঙ) কত দিন **সখিরে** না হেরি।

৩। উপযুক্ত শব্দ (পাঠ্যাংশ হইতে) ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) কেমনে — বল্ মেঘে যবে —
বসিত — ধরি করে,
তুই সে — অঙ্গে — কত রঙ্গে
ঘটা করি — —।

(খ) কত দিন — নাই ঘুচায়ে —।
সুরবৃন্দ — ঘেরি।
— — সুখে খেলিতাম সবে
অমর — সহ।

মৌখিক :

১। (ক) কবিতাটির কবির নাম কি ? কবির কোন কাব্য হইতে কবিতাটি গৃহীত ?

(খ) বৃত্রাসুর কে ছিলেন ? তিনি কি করিয়াছিলেন ?

(গ) ইন্দ্রের পত্নী শচীকে বৃত্রাসুর কোথায় রাখিয়াছিলেন ?

২। (ক) আখণ্ডল, কার্মুক, বাসব, সুরবৃন্দ শব্দগুলির অর্থ বল।

(খ) পারিজাত কি ? কোথায় পাওয়া যায় ?

(গ) 'মনোলোভা' ও 'চিরানন্দ' শব্দ দুইটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর।



অমৃতের সন্তান

কাজি নজরুল ইসলাম

[কাজি নজরুল ইসলামের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। নজরুল অল্পবয়সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং বাঙালী পল্টনের হাবিলদার হন। 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী' কবি হিসাবে খ্যাতিমান হন। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'অগ্নিবীণা' 'বিষের বাঁশি', 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কবিতাটি তাঁহার বিখ্যাত 'মায়ামুকুর' কবিতার অংশ বিশেষ। শিশুকেই বড় হইয়া মহামানব হইতে হইবে ইহাই কবির বক্তব্য।]

আমার মনের মায়া-দর্পণে তোমাদের দেখিয়াছি,
দেখেছি সেখানে কত যে পার্থ-সারথি, সব্যসাচী।
অনাগত মহা-ভারতের কুরুক্ষেত্র তোমরা সবে
ধর্মরাজ্য আনিতে আবার মেতেছ রণোৎসবে
তোমাদেরি মাঝে দেখিনু আসিছে কত যে যুগাবতার,
তোমরা ভাঙিয়া সব জাতিভেদ করিতেছ একাকার।
অন্নবস্ত্র দিতেছ তোমরা ক্ষুধাতুর জনগণে,
হনন করিছ হিংসা-পশুরে, আছে যা মানব-মনে।
কেহ মহর্ষি হইতেছে জ্ঞানে, কেহ গলিতেছ প্রেমে,
কেহ বা বিপুল কর্মশক্তি লইয়া আসিছে নেমে।
চাকরি করিতে লভনি জনম, তোমরা দেবতা সবে,
দিব্যশক্তি ভাগবতী জ্যোতি এই মানুষেই লভে।
ভাঙো ভাঙো এই ক্ষুদ্র গণ্ডী, এই অজ্ঞান ভোলো,
তোমাতে বিরাজে হে মহামানব, তাহারে জাগায়ে তোলো।
তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি 'মহতো মহীয়ান্'।
জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট, অমৃতের সন্তান।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। কবিতাটির মর্মার্থ সরল ভাষায় প্রকাশ কর।

২। অমৃতের সন্তান কাহাদের বলা হইয়াছে? কবি তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কি আশা পোষণ করেন?

৩। পার্থ সারথি, কুরুক্ষেত্র, ধর্মরাজ্য, মহাভারত সম্বন্ধে টীকা লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) 'অন্নবস্ত্র দিতেছ তোমরা ক্ষুধাতুর জনগণে,'
—কবিতাটির কবির নাম কি? কোন্ কবিতা হইতে লাইনটি গ্রহণ করা হইয়াছে? কাহাদের কথা এখানে বলা হইয়াছে? কাহারা কিভাবে ক্ষুধাতুর জনগণকে অন্নবস্ত্র দান করিতেছে?

(খ) 'চাকরি করিতে লভনি জনম, তোমরা দেবতা সবে।'
—কোন্ কবিতার লাইন? কবির নাম কি? কাহাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলা হইয়াছে? 'চাকরি' না করিয়া কি করিবে? 'দেবতা' বলিবার কারণ কি?

(গ) 'তোমাতে বিরাজে হে মহামানব, তাঁহারে জাগায়ে তোলো।'
—কোন্ কবিতার লাইন? কবির নাম কি? কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথাগুলি বলা হইয়াছে? তাহার মধ্যে কাহাকে জাগাইয়া তুলিতে বলা হইয়াছে? এরূপ বলিবার কারণ কি?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) তোমাদেরি মাঝে.........করিতেছ একাকার।

(খ) অন্নবস্ত্র দিতেছ.........নেমে।

(গ) ভাঙো ভাঙো.........জাগায়ে তোলো।

(ঘ) তুমি নহ শিশু দুর্বল, তুমি 'মহতো মহীয়ান'।
জাগো দুর্বার, বিপুল, বিরাট, অমৃতের সন্তান।
—কোন্ কবিতার লাইন? কোন্ প্রসঙ্গে কবি এই কথাগুলি বলিয়াছেন? লাইন দুইটির ব্যাখ্যা কর।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ:
দুর্বার, গণ্ডী, রণোৎসব, হনন, মহীয়ান, সব্যসাচী, মায়াদর্পণ।

(খ) বাক্য রচনা কর :

বিরাট, অজ্ঞান, দুর্বল, কর্মশক্তি, একাকার, ক্ষুধাতুর, ধর্মরাজ্য।

(গ) সন্ধি বিচ্ছেদ কর : অনাগত, রণোৎসব, যুগাবতার, একাকার, ক্ষুধাতুর, মহর্ষি, দুর্বার।

(ঘ) বিপরীত শব্দ লিখ : বিরাট, অমৃত, দুর্বল, অজ্ঞান, জ্যোতি, ক্ষুদ্র।

(ঙ) গদ্যরূপ লিখ : যেতেছ, দেখিনু, আসিছে, করিছ, লভনি, জনম।

(চ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : দিব্যশক্তি, মহর্ষি, মায়াদর্পণ, পার্থ-সারথি, সব্যসাচী, ধর্মরাজ্য, রণোৎসব, যুগাবতার, অন্নবস্ত্র, ক্ষুধাতুর, জনগণে, হিংসা-পশু, কর্মশক্তি, মহামানব।

২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) **তোমাতে** বিরাজে হে মহামানব। (খ) তোমরা **দেবতা** সবে। (গ) তাঁহারে **জাগায়ে** তোলো। (ঘ) **অন্নবস্ত্র** দিতেছ তোমরা ক্ষুধাতুর জনগণে। (ঙ) **ধর্মরাজ্য** আনিতে আবার যেতেছ **রণোৎসবে**।

৩। পাঠ্যাংশ হইতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

আমার মনের — তোমাদের —
দেখেছি সেখানে কত যে —, —।
— মহাভারতের — তোমরা সবে
— আনিতে আবার যেতেছ —।

মৌখিক

১। (ক) কবিতাটির কবির নাম বল এবং কবির কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ কর।

(খ) কবি সাধারণতঃ কি বিশেষণে ভূষিত?

(গ) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(ঘ) কবি কাহাদের অমৃতের সন্তান বলিয়াছেন? এইরূপ বলিবার কারণ কি?

(ঙ) 'সব্যসাচী' কাহাকে বলা হয়? বলিবার কারণ কি?

২। (ক) 'ধর্মরাজ্য' কে স্থাপন করিয়াছিলেন?

(খ) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল?



বাংলার পল্লী • সুকান্ত ভট্টাচার্য

[কবি অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন। তবুও বাংলা কবিতায় তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বাংলার পল্লী' কবিতাটি 'ঘুম নেই' কাব্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।]

এখানে বৃষ্টি-মুখর লাজুক গাঁয়ে
এসে থেমে গেছে ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা
সবুজ মাঠেরা পথ দেয় পায়ে পায়ে
পথ নেই তবু এখানে যে পথ হাঁটা।
এ গ্রামের পাশে মজা নদী বারো মাস
বর্ষায় আজ বিদ্রোহ বুঝি করে,
গোয়ালে পাঠায় ইশারা সবুজ ঘাস।
এ গ্রামে নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।
রাত্রি এখানে স্বাগত সান্ধ্য-শাঁখে
কিষাণকে ঘরে পাঠায় সে আল-পথ ;
বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা এখানে জড়ো করে জনমত।
দুর্ভিক্ষের আঁচড় জড়ানো গায়ে,
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,
কৃষক-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে
প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে।
রাত্রি হ'লেই দাওয়ার অন্ধকারে
ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে,
কেমন ক'রে সে অকালেতে গতবারে

চলে গেল লোক দিশাহারা দিকে দিকে।
এখানে সকাল ঘোষিত পাখীর গানে ;
কামার, কুমোর, তাঁতী তার কাজে জোটে
সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষীর কানে
একটানা কত বিচিত্র ধ্বনি ওঠে।
হঠাৎ সেদিন জল আনিবার পথে
কৃষক-বধূ যে থমকে তাকায় পাশে,
ঘোমটা খুলে সে দেখে নেয় কোনমতে
সবুজ ফসলে সুবর্ণ যুগ আসে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। কবিতাটিতে কবি যে পল্লীচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। কবিতাটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখ।

৩। কবিতাটিতে গার্হস্থ্য জীবনের একটি পরিচয় পাওয়া যায়—অল্প কথায় লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) বুড়ো বটতলা পরস্পরকে ডাকে
সন্ধ্যা এখানে জড়ো করে জনমত।

—কোন্ কবিতা হইতে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে? কবির নাম কি? 'বুড়ো বটতলা' কাহাদের ডাকে? ডাকিবার কারণ কি? 'সন্ধ্যা' কি ভাবে 'জনমত জড়ো' করে? জনমত কথার অর্থ কি?

(খ) দুর্ভিক্ষের আঁচড় জড়ানো গায়ে,
এ গ্রামের লোক আজো সব কাজ করে,

—কোন্ কবিতা হইতে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে? কবির নাম কি? 'দুর্ভিক্ষের আঁচড়' বলিতে কি বুঝান হইয়াছে? কোন্ গ্রামের কথা বলা হইয়াছে? সেই গ্রামের লোকেরা কি কি কাজ করে?

(গ) 'ঠাকুমা গল্প শোনায় যে নাতনীকে'

—কোন্ কবিতার লাইন? কবির নাম কি? ঠাকুমা নাতনীকে কি গল্প শুনায়?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। (ক) ঘোমটা খুলে সে দেখে নেয় কোনমতে
'সবুজ ফসলে স্বর্ণ যুগ আসে'—লাইনটির ব্যাখ্যা লিখ।
—কাহার ঘোমটার কথা বলা হইয়াছে? কে ঘোমটা খুলিয়া কি দেখে? 'সবুজ ফসলে স্বর্ণ যুগ আসে'—লাইনটির ব্যাখ্যা লিখ।

(খ) ব্যাখ্যা লিখ :

(১) এখানে বৃষ্টি·········যে পথ হাঁটা।
(২) দুর্ভিক্ষের আঁচড়·········জলে ঘরে ঘরে।
(৩) রাত্রি হ'লেই·········দিশাহারা দিকে দিকে।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) পদ পরিবর্তন কর : ব্যস্ত, বিদ্রোহ, সন্ধ্যা, ঘোষিত, লাজুক।

(খ) অর্থ লিখ : দুর্ভিক্ষ, আকাল, দিশাহারা, স্বর্ণযুগ, ইশারা, ঘাগরা, আল-পথ, জনমত।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ : আল-পথ, দিশাহারা, কৃষক-বধু, বৃষ্টিমুখর, স্বর্ণ যুগ, দুর্ভিক্ষ, বারোমাস।

(ঘ) বাক্যরচনা কর :
থমকে, ধ্বনি, দিশাহারা, লাজুক, ব্যস্ত, বিদ্রোহ, ইশারা, স্বাগত।

(ঙ) দুইটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ : ব্যস্ত, ইশারা, স্বাগত, বিচিত্র।

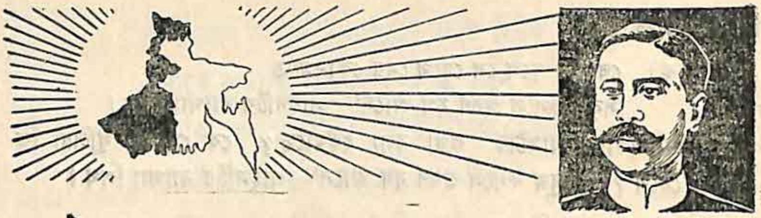
২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :
(১) **ঘোমটা** খুলে সে দেখে নেয় কোনমতে (২) সবুজ **ফসলে** স্বর্ণযুগ আসে। (৩) ঠাকুমা গল্প **শোনায়** যে নাতনীকে (৪) সবুজ মাঠেরা পথ দেয় **পায়ে পায়ে**। (৫) এ **গ্রামে** নতুন সবুজ ঘাগরা পরে।

মৌখিক

১। (ক) 'বাংলার পল্লী' কবিতাটির রচয়িতার নাম কি? কবির কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম কর। (খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর। (গ) গ্রামের পাশের মজা নদী বর্ষাকালে কিভাবে বিদ্রোহ করে? (ঘ) 'আলপথ' কিভাবে কিষাণকে 'ঘরে' পাঠায়? (ঙ) সন্ধ্যা কিভাবে 'জনমত' জড়ো করে?

২। (ক) 'বিদ্রোহ' কথার অর্থ কি? (খ) 'আকাল' কাহাকে বলে? 'আকাল' কিভাবে দেখা দেয়? (গ) 'কৃষক'-বধূরা ঢেঁকিকে নাচায় পায়ে'—অর্থ বল। (ঘ) সারাটা দুপুর ক্ষেতের চাষীর কানে বিচিত্র ধ্বনি কিরূপে জাগে?

———



মাইকেল মধুসূদন

নবীন চন্দ্র সেন

[১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের নয়াপাড়ায় নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। তাঁহার মৃত্যু ঘটে ২৩শে জানুয়ারি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'অবকাশ-রঞ্জনি', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রঙ্গমতী', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'অমিতাভ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কবিতাটি মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। কবিতাটিতে নবীনচন্দ্রের মাইকেলের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে।]

কৃতঘ্ন মা বঙ্গভূমি! এতদিন তব
কবিতা-কানন
যেই পিকবর-কল উছলিল, বনদল
উছলিত, ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন।
সে মধু-সখারে আজি পাষাণ পরাণে,
কি বলিব হায়!
অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বর,
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়।
মধুর কোকিল কণ্ঠে অমৃতলহরী—
কে আর এখন,
দেশ দেশান্তরে থাকি, শ্যামাজন্মদে ডাকি
নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ?
তোমার মানস-খানি করিয়া বিদায়
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন হায়! কতদিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন? ফলিবে কি আর?

শূন্য হ'ল আজি বঙ্গ কবি-সিংহাসন
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ রবি
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন !

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। মধুসূদনের মৃত্যুতে বাংলা কাব্য সাহিত্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা কবি নবীনচন্দ্র সেন কিরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—তোমার নিজের ভাষায় বল।

২। বঙ্গভূমিকে 'কৃতঘ্ন' বলিবার কারণ কি? এই কবিতাটি কি উপলক্ষে এবং কাহার উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছে?

৩। "বঙ্গ কবি কুলেশ্বর" কে? "ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়" —বলিবার কারণ কি?

৪। কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) 'ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন'—বলিবার কারণ কি? এখানে কাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে?

(খ) 'শ্যামা জন্মদে'—বলিতে কি বুঝ? কেন এই কথা বলা হইয়াছে?

(গ) "শূন্য হ'ল আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন"—এইরূপ বলিবার কারণ কি? 'বঙ্গ-কবি-সিংহাসন'—কথাগুলির অর্থ কি?

(ঘ) 'বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন'—শমন কে? কিভাবে বঙ্গের কবিতা-মধুকে হরণ করিল? কবিতা-মধু বলিতে কি বুঝ?

(ঙ) "ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়।" —কোন্ কবিতার লাইন? কবির নাম লিখ। কাহার উদ্দেশ্যে কবিতাটি লেখা হইয়াছে? 'ভিক্ষুকের বেশে'—বলিবার কারণ কি? 'বিদায়' দিবার কথা বলা হইয়াছে কেন?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। (ক) অযত্নে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বর,
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়।
—কোন্ প্রসঙ্গে কবি এই কথা বলিয়াছেন? ব্যাখ্যা লিখ।

(খ) তোমার মানস-খানি করিয়া বিদায়
কাল দুরাচার,
হরিল যে রত্ন হায়! কতদিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন? ফলিবে কি আর?

—কবি কোন্ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলিয়াছেন? এইরূপ বলিবার কারণ কি? 'মানস-খানি'-বলিতে কি বুঝ? 'কাল দুরাচার' কাহার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে? 'রত্ন' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? লাইনগুলির ব্যাখ্যা কর।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) গদ্যরূপ লিখ: হরিল, মোহিবে, মুদিল, উছলিত, বাঁশরী, পরাণে।

(খ) অর্থ লিখ: কৃতঘ্ন, লহরী, মোহিবে, মানস-খানি, দুরাচার, শমন, অমৃতলহরী, তানে, কল্পনা-সরোজ রবি।

(গ) সমাস নির্ণয় কর: কবিতা-কানন, বঙ্গ-কবি-কুলেশ্বর, অমৃত-লহরী, দেশান্তর, মানস-খানি, বঙ্গ কবি-সিংহাসন, মধু-সখারে, অনাদরে।

(ঘ) বাক্য রচনা কর:

পাষাণ, দেশান্তর, দুরাচার, পুনরায়, শাসন, রত্ন, অনন্য।

(ঙ) দুইটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ: সরোজ, রত্ন, শ্যাম, কৃতঘ্ন।

(চ) প্রকৃতি প্রত্যয় লিখ: কৃতঘ্ন, শ্রবণ, রত্ন।

(ছ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: কৃতঘ্ন, মধুর, অনাদরে, ভিক্ষুক, বিচার, অমৃত, দেশ, নূতন, শূন্য, মুদিল, হরিল।

২। (ক) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর:

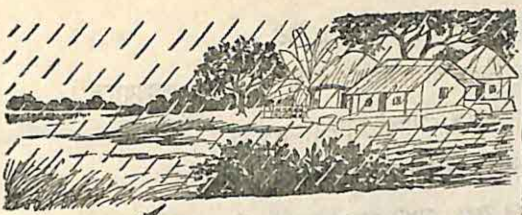
(১) সে **মধু-সখারে** আজি পাষাণ পরাণে (২) **ভিক্ষুকের** বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়। (৩) **দেশ দেশান্তরে** থাকি, (৪) হরিল যে **রত্ন** হায়! (৫) **বঙ্গের** কবিতা-মধু হরিল শমন!

(খ) টীকা লিখ: কবিতা কানন, পিকবর-কল-উছলিল, বনদল উছলিত, ব্রজে শ্যাম বাঁশরী যেমন, শ্যামা জন্মদে, ফলিবে এমন রত্ন।

মৌখিক

১। (ক) মাইকেল মধুসূদন কে ছিলেন? কবিতাটি কোন্ কবির লেখা? কবির কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখ। (খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর। (গ) বঙ্গ কবি কুলেশ্বর কে? তাঁহাকে এইরূপ বলিবার কারণ কি? (ঘ) 'শ্যামা জন্মদে' বলিতে কি বুঝ? (ঙ) 'রত্ন' কাহাকে কি অর্থে বলা হইয়াছে?

২। (ক) শূন্য হ'ল আজি 'বঙ্গ-কবি-সিংহাসন'—কেন এবং কাহার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে? (খ) বঙ্গভূমিকে 'কৃতঘ্ন' বলিবার কারণ কি?




বর্ষায় • করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

[জন্ম ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর ; মৃত্যু ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী। নিবাস—নদীয়া জেলার শান্তিপুর। বি. এ. পাশ করিবার পর অনেক স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী করেন, পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস সমূহের পরিদর্শকরূপে কাজ করেন। ছোটবেলা হইতেই তাঁহার কবি প্রতিভার উন্মেষ হয়। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগুলি হইতেছে প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধানদূর্বা, শতনরী, রবীন্দ্র-আরতি প্রভৃতি। তিনি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "জগত্তারিণী স্বর্ণপদক" লাভ করেন। বর্তমান কবিতাটিতে গ্রামের বর্ষার রূপ তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তুচ্ছ বিষয়ও তাঁহার কবিদৃষ্টি হইতে বাদ পড়ে নাই।]

গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে 'ঢল',
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল—বড় দুরন্ত মেয়ে !
ডুবে গেছে মাঠ, গঞ্জের ঘাট,
অশ্বত্থের তলে বসে নাকো হাট,
সারা দিনরাত বৃষ্টির ঝাঁট ঝরিতেছে একঘেয়ে
ভাসিল পুকুর আউশের ভুঁই,
পালায় কাৎলা কালবোস রুই,
আঙিনায় জল করে ছলছল, ব্যাঙ ডাকে হাঁস চরে !
কাঁটালি চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল বাতাস,
গাছভরা জাম সুচিকণ শ্যাম ফেটে যায় রসভরে !
ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই ;

ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই,
চ'লে গেছে চিল, গগনের নীল গ'লে গেছে জলধারে।
রাঙা আঁখি মেলি' আনারস-রাজ
পরিয়াছে শিরে মরকত-তাজ,
লেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ-চন্দন-দীঘি পারে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। কবিতাটিতে বর্ষার যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার বর্ণনা দাও।

২। বর্ষাকে কাহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে? বর্ষার আবির্ভাবে প্রকৃতির যে পরিবর্তন চোখে পড়ে তাহার বর্ণনা দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) এসেছে বরষা বড় চঞ্চল—বড় দুরন্ত মেয়ে!
—দুরন্ত মেয়ে কে? তাহাকে এইরূপ বলিবার কারণ কি? বরষার 'চঞ্চল রূপ'টি প্রকাশ কর।

(খ) ভিজে ভিজে নীড় বুনিছে বাবুই
ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই,
—কোন্ কবিতা হইতে এই লাইন দুইটি গ্রহণ করা হইয়াছে? কবির নাম কি? বাবুই পাখীর বাসা দেখিতে কেমন? কোন্ সময় ইহারা বাসা বুনে? 'ঝাপটে ঝটিকা ছুটিছে হাউই'—লাইনটির অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ কর।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন

১। (ক) গ্রামে ঢোকে জল, গাঙে নামে 'ঢল',
আকাশের কোলে কোমল কাজল,
এসেছে বরষা বড় চঞ্চল—বড় দুরন্ত মেয়ে!

—'ঢল' শব্দটির অর্থ কি? কোন্ সময় 'ঢল' নামে? "আকাশের কোলে কোমল কাজল"—লাইনটির অর্থ কি? শেষ লাইনটির ব্যাখ্যা লিখ।

(খ) চ'লে গেছে চিল, গগনের নীল গ'লে গেছে জলধারে।
—লাইনটির ব্যাখ্যা লিখ। চিল চলিয়া যাইবার কারণ কি? কিভাবে গগনের নীল গলিয়া গিয়াছে তাহা বল।

২। ব্যাখ্যা লিখ : (ক) রাঙা আঁখি মেলি'……দীঘি পারে।
(খ) গাছভরা জাম……রসভরে !

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ : দুরন্ত, চঞ্চল, সুচিকণ, মরকত, তাজ, ঢল, একঘেয়ে, আঙিনায়, ভুঁই, গঞ্জ, সুবাস, নীড়, ঝটিকা, হাউই।

(খ) পদ পরিবর্তন কর : কোমল, চঞ্চল, দুরন্ত, নীল, মধুর, শ্যাম।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ।
সুবাস, গাছভরা, জলধারে, দীঘি পারে, বাদল বাতাস।

(ঘ) বাক্যরচনা কর : গঞ্জ, কোমল, ছলছল, তীব্র, শ্যাম, ঝটিকা, আঁখি, হাউই, সুবাস।

(ঙ) কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :
(১) **গ্রামে** ঢোকে জল, (২) অশ্বথের **তলে** বসে নাকো হাট,
(৩) **ব্যাঙ ডাকে, হাঁস চরে,** (৪) চ'লে গেছে **চিল,**
(৫) পরিয়াছে **শিরে** মরকত তাজ।

(চ) বিপরীত শব্দ লিখ : কোমল, চঞ্চল, দুরন্ত, ভাসিল, তীব্র।

(ছ) নিম্নের অংশটি গদ্যরূপ লিখ :
কাঁটালি-চাঁপার তীব্র সুবাস
মাতাল করেছে বাদল বাতাস,
গাছভরা জাম সুচিকণ শ্যাম ফেটে যায় রসভরে !

মৌখিক

১। (ক) 'বর্ষায়' কবিতাটির কবির নাম বল। কবির আরও কয়েকটি কাব্য ও কবিতার নাম বল।

(খ) তোমার পাঠ্যপুস্তকে এই ধরণের আর কোন কবিতা থাকিলে তাহার উল্লেখ কর।

(গ) 'আউশের ভুঁই'—বলিতে কি বুঝ ?

(ঘ) 'ঢল'—শব্দটির অর্থ কি ? কখন ঢল নামে ? 'ঢল' নামিলে কি অবস্থা হয় ?

(ঙ) 'আনারস রাজ' বলিবার কারণ কি ? তাহার মাথায় 'মরকত তাজ' বলিতে কি বুঝ ?

২। (ক) কবিতাটিতে কি কি গাছ, ফুল ও ফলের উল্লেখ আছে ?

(খ) কবিতাটিতে কোন্ কোন্ জীব, মাছ ও পাখীর উল্লেখ আছে।

(গ) 'অশ্বথের তলে বসে নাকো হাট'—হাট না বসিবার কারণ কি ?

(ঘ) 'লেবুর কুঞ্জে মধুর গন্ধ-চন্দন-দীঘি পারে'।—লাইনটির অর্থ কি ?

যদি



কুমুদ রঞ্জন মল্লিক

[বর্ধমান জেলার কো-গ্রামে কুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প কিছুদিন হইল তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। বনতুলসী, উজানি, একতারা, বীথি, বনমল্লিকা, অজয় প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। বর্তমান কবিতায় তিনি এক সুন্দর নীতি ও জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া মানুষ কাজ করিলে হাজার দুঃখের মধ্যেও মানুষ হিসাবে মহত্ত্ব লাভ করা যায়।]

যদি তুমি বশে রেখে দিতে পার
চঞ্চল তব চিত্তকে,
ন্যাস বলে যদি ভেবে নিতে পার
তুমি তব সব বিত্তকে,
সন্তোষে যদি বহে' যেতে পার
হয়েছে যে ভার অর্পিত,
সম্পদে যদি বহিরন্তরে
নাহি হও তুমি গর্বিত,
প্রেমে আপনার করে' নিতে পার
যদি এ নীরস পৃথ্বীকে,
বিফলতা মাঝে বরে' নিতে পার
যদি চিরাগত সিদ্ধিকে ;
সমভাবে যদি সহে যেতে পার
তুমি সম্মান লাঞ্ছনা,
বঞ্চিত হয়ে যদি তুমি কভু
অপরে না কর বঞ্চনা,
ভোগে উন্মুখ, ত্যাগে উদ্‌গ্রীব,
সত্যেতে চির-বিশ্বাসী,

ধরণীর রস মধুপের মত
যদি নিতে পার নিঃশেষি,
অভাবেও যদি ভাবের অলকা
গড়ে নিতে পার বক্ষেতে,
সুখের মাঝারে বিভুর লাগিয়া
যদি ধারা বহে চক্ষেতে,
না হয়ে ঘৃণিত ঘৃণা সহ যদি,
নিন্দা না কর নিন্দুকে,
বড় করে' যদি নিজ চোখে দেখ
নিজ ক্ষীণ দোষ-বিন্দুকে,
ছোট করে' যদি দেখ তুমি শুধু
আপন সুনাম সুখ্যাতি,
আপনার যদি ক'রে নিতে পার
অপরের ক্লেশ-দুঃখাদি,
মুক্ত গৃহেতে ঘুমাইতে পার
যদি বিদ্রোহ-বিগ্রহে,
বিবেকের বুকে জড়াইতে পার
যদি অপমান—নিগ্রহে,
অত্যাচারীকে বাধা দিতে পার
পাহাড়ের মত নির্ভয়ে,
আতুরের তুমি পান্থ-পাদপ—
যদি করুণার ক্ষীর বহে
একসুরে যদি বেঁধে নিতে পার
ভাব ভাষা আর কর্মকে
ধরা হ'ত যদি বড় করে তুমি
দেখ মনে-প্রাণে ধর্মকে
বুঝিবে তখন মানুষ হয়েছে,
ঝরিছে করুণা মস্তকে

পরশ-মাণিক এসেছে সম্মুখে
পেতে দিও তুটি হস্তকে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। কবিতাটির বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লিখ।

২। কবিতাটির মধ্য হইতে কি নীতিজ্ঞান লাভ করিলে তাহা আলোচনা কর।

৩। নিজেকে কেমনভাবে পরিচালিত করিলে মহৎ জীবন লাভ করা যায় তাহা 'যদি' কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর।

৪। কবির মতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কিভাবে লাভ করা যায় আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) 'বড় করে' যদি নিজ চোখে দেখ
নিজ ক্ষীণ দোষ-বিন্দুকে',

—কোন্ কবিতা হইতে এই লাইন তুইটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে? কবির নাম কি? কবি কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছেন? এইরূপ বলিবার কারণ কি?

(খ) 'অত্যাচারীকে বাধা দিতে পার
পাহাড়ের মত নির্ভয়ে,'

—কোন্ কবিতা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে? কবির নাম কি? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছেন? এইরূপ বলিবার কারণ কি?

(গ) 'বুঝিবে তখন মানুষ হয়েছ,

—কোন্ কবিতা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে? কবির নাম কি? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে? কিভাবে মানুষ হইবার কথা বলা হইয়াছে?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা কর:

(ক) ত্যাগ বলে যদি……তব সব বিত্তকে। (খ) সম্পদে যদি…… সিদ্ধিকে। (গ) ভোগে উন্মুখ………চক্ষেতে। (ঘ) বুঝিবে তখন………দিও তুটি হস্তকে।

—কোন্ কবিতার লাইন? পরশ মাণিক কি? ইহার প্রসঙ্গ এখানে কি জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে? স্তবকটির ব্যাখ্যা লিখ।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) সমাস নির্ণয় কর: বাহিরস্তরে, পরশ-মাণিক, পান্থপাদপ, সুখ্যাতি, চিরাগত, করুণার ক্ষীর, দোষ-বিন্দু।

(খ) বিপরীত শব্দ লিখ: চঞ্চল, নীরস, বিহ্বলতা, সুনাম, করুণা।

(গ) বাক্য রচনা কর: চিরাগত, অর্পিত, লাঞ্ছনা, অলকা, সুনাম।

(ঘ) অর্থ লিখ: চিত্ত, ন্যাস, বিত্ত, পৃথ্বী, অর্পিত, মধুপ, উন্মুখ, নিগ্রহ, আতুর, বিগ্রহ, ক্ষীর।

(ঙ) গদ্যরূপ লিখ: বহে, বরে, সহে, নিঃশেষি।

২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর:

(ক) **ভোগে** উন্মুখ, **ত্যাগে** উদ্‌গ্রীব। (খ) **সুখের** মাঝারে বিভুর লাগিয়া। (গ) মুক্ত **গৃহেতে** ঘুমাইতে পারে। (ঘ) **পাহাড়ের** মত **নির্ভয়ে**। (ঙ) পেতে দিও দুটি **হস্তকে**।

৩। উপযুক্ত (পাঠ্যপুস্তক হইতে) শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) সমভাবে যদি—যেতে—
তুমি সম্মানে—,
—হয়ে যদি তুমি কভু
—না কর—।

(খ) একসুরে যদি — নিতে পার
ভাব — আর —
ধরা হ'ত যদি — করে —
—মনে-প্রাণে —।

মৌখিক

১। (ক) কবির কয়েকটি কাব্যের নাম লিখ। (খ) 'পান্থপাদপ' কি ? (গ) কবি 'ধরা হতে' মনে প্রাণে 'ধর্ম'কে বড় করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন ? (ঘ) 'পরশ মাণিক' কি ? (ঙ) 'ভোগে উন্মুখ, ত্যাগে উদ্‌গ্রীব'—অর্থ প্রকাশ কর। (চ) ন্যাস' কথার অর্থ কি ?

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও:

(ক) বিফলতার মাঝে কিভাবে সিদ্ধিকে বরণ করা যায় ?

(খ) 'সুখের মাঝারে বিভুর লাগিয়া/যদি ধারা বহে চক্ষেতে' —কিভাবে তাহা সম্ভব বুঝাইয়া বল।



বাদল বিদায় • যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

[যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আদি নিবাস ছিল শান্তিপুরের নিকটবর্তী হরিপুর গ্রামে। মরীচিকা, মরুমায়া, মরুশিখা, সায়ম, ত্রিযামা তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে তাঁহাকে 'দুঃখ-বিদ্রোহবাদী কবি' বলা হয়।]

আষাঢ় গিয়াছে শ্রাবণ গিয়েছে ভাদর বসেছে যেতে,
কেহ নাই তার শেষ বারিধার নিতে হয় মাথা পেতে'।
আজি আকাশের চোখে শেষ জল ঝরায় ভাদর রাতি,
গোপনে ধরণী ধরিছে সে ধারা শেষ অঞ্জলি পাতি'।
তোমরা শিশুর দলে
কে ভিজিতে চাও এই সন্ধ্যায় শেষ বাদলের জলে ?
বর্ষার ছাঁটে যে-সব সুবোধ শার্সি আঁটিয়া আছে,
বাদলের হাওয়া অঙ্গে লাগিলে যারা ঘন ঘন হাঁচে,
তাদের নিও না সাথে,
বর্ষা এড়ায়ে ঘরে থাক্ তারা বেঁচে থাক্ দুধে ভাতে।
তোমাদের মাঝে অবুঝ যাহারা কারণে ও অকারণে
বর্ষায় ভেজা ভালোবাসো ভাই তারা এসো মোর সনে
এসো দেখে আসি ভাঙিছে পদ্মা শেষ বালু-বন্ধন,
এসো শুনে আসি বাতাসের শেষ অরণ্যে ক্রন্দন।
ভাদরের ব্যথা বুঝাবার নহে—বড় দুর্দিন ভাই,
আঁধারের শূত বজ্রে ঘোষিছে আশ্বিনে হাসি চায়,
তোমরাও ভাই হেসো।

শুধু বাদলের বিদায় বেলায় বারেক বাহিরে এসো।
এবারের মত বাদল ফুরায় বিদায় দিই গে চল,
আবার বাদল আসে কি না আসে কেবা জানে ভাই বল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। কবিতাটির সারমর্ম লিখ।

২। কবি শেষ বাদলকে বিদায় জানাইবার জন্য কাহাদের আহ্বান করিয়াছেন? বাদল বিদায় দিতে গিয়া তিনি কি কি দেখিতে চান?

৩। বাদল বিদায় দেখিবার জন্য কবি কাহাদের আহ্বান করেন নাই? না করিবার কারণ কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) 'বর্ষা এড়ায়ে ঘরে থাক্ তারা বেঁচে থাক্ দুধে ভাতে।'
—কোন্ কবিতার লাইন? কবির নাম কি লিখ। এখানে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? তাহাদের কবি ঘরে থাকিতে বলিয়াছেন কেন? কবি কাহাদের ঘরের বাইরে কি কারণে আহ্বান করিয়াছেন?

(খ) 'বর্ষায় ভেজা ভালোবাসো ভাই তারা এসো মোর সনে'—
—কোন্ কবিতার লাইন? কবির নাম কি? কবি কি দেখিবার ও বুঝিবার জন্য শিশুদের আহ্বান করিয়াছেন?

(গ) 'আঁধারের শূত বজ্রে ঘোষিছে আশ্বিনে হাসি চায়',
—কোন্ কবিতার লাইন? কবির নাম কি? আঁধারের শূত কে? 'আশ্বিনের হাসি চায়' কথাগুলির অর্থ কি?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ: (১) আজি আকাশের……পাতি। (২) তোমাদের মাঝে অবুঝ………ক্রন্দন। (৩) ভাদরের ব্যথা………ভাই বল।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) গদ্যরূপ লিখ: ভাদর, রাতি, ঘোষিছে, ভাঙিছে, সনে।

(খ) অর্থ লিখ: শার্সি, অবুঝ, বালু, বন্ধন, বারেক, অঞ্জলি, সুবোধ।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর:
বালুবন্ধন, দুর্দিন, অকারণে, বারিধারা।

(ঘ) বিপরীত শব্দ লিখ :

শেষ, সুবোধ, অবুঝ, কারণে, ভাঙিছে, ক্রন্দন, দুর্দিন।

(ঙ) বাক্য রচনা কর :

বারেক, ফুরায়, ক্রন্দন, অকারণ, আঁটিয়া, অঞ্জলি, ধরণী।

(চ) দুইটি করিয়া সমার্থক শব্দ লিখ : ধরণী, রাতি, অঙ্গ, আঁধার।

২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(১) **ভাদরের** ব্যথা বুঝাবার নহে। (২) **তাদের** নিও না সাথে। (৩) **বর্ষার ছাঁটে** যে সব সুবোধ **শার্সি** আঁটিয়া আছে। (৪) আজি আকাশের **চোখে** শেষ জল ঝরায় ভাদর রাতি। (৫) এসো শুনে আসি বাতাসের শেষ **অরণ্যে** ক্রন্দন।

৩। টীকা লিখ :

গোপনে ধরণী ধরিছে সে ধারা শেষ|অঞ্জলি পাতি' ; এসো দেখে আসি ভাঙিছে পদ্মা শেষ বালু-বন্ধন ; এসো শুনে আসি বাতাসের শেষ অরণ্যে ক্রন্দন ; আঁধারের শূত বজ্রে ঘোষিছে আশ্বিনে হাসি চায়।

৪। পাঠ্যপুস্তক হইতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) শুধু বাদলের বিদায় বেলায় — বাহিরে —।

এবারের মত — — বিদায় দিই গে চল,

— — বাদল আসে কি না আসে — — ভাই বল।

মৌখিক

১। (ক) 'বাদল বিদায়' কবিতাটি কাহার লেখা? কবির আরও দুই একটি কাব্যের নাম লিখ। (খ) কবিতাটি আবৃত্তি কর। (গ) 'বারেক' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর। (ঘ) 'বাদল বিদায়' দিবার জন্য সুবোধ ছেলেদের কবি আহ্বান করিতে চাহেন না কেন? (ঙ) 'বাদল বিদায়' দিবার জন্য কবি কেন আহ্বান করিয়াছেন?

২। (ক) 'আঁধারের শূত' বলিতে কি বুঝ? (খ) 'বেঁচে থাক্ দুধে ভাতে' —অর্থ বল। (গ) কবির মতে কোন্ মাসে বাদল বিদায় নিতে চায়? (ঘ) 'শার্সি' শব্দটির অর্থ কি? (ঙ) পদ্মা কোন্ দেশের নদী? (চ) 'তোমাদের মাঝে অবুঝ যাহারা কারণে ও অকারণে' লাইনটির অর্থ বল।





পল্লী-জননী • জসিমউদ্দীন

[জসিমউদ্দীন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তম্বুরখান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পল্লীর চিন্তাই কবিতার মূল বিষয়। 'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'রাখালী', 'ধানক্ষেত' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তিনি দীর্ঘদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লীগীতি সংগ্রহ বিভাগের প্রধান ছিলেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হন।]

রাত থম্ থম্ শব্দ নিঝুম ঘনঘোর আঁধিয়ার,
নিঃশ্বাস পড়ে, তাও শোনা যায় নিঃসাড় চারিধার।
ভন্ ভন ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
এঁদো ডোবা হ'তে বহিছে বাতাস পচানো পাতার ঘ্রাণ
ছোট কুঁড়েঘর বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতল বায়ু।
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।
নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
'ছেলেরে আমার ভাল ক'রে দাও'—কাঁদে জননীর প্রাণ।
'ভাল ক'রে দাও আল্লা রছুল, ভাল ক'রে দাও পীর,'
কহিতে কহিতে বুকখানি ভাসে বহিয়া নয়ন-নীর।
যে কথা ভাবিতে পরান শিহরে তাই ভাসে হিয়া-কোণে
'বালাই, বালাই, ভাল হবে বাছা'—স্বপ্নের জাল বোনে।
কত কথা মনে পড়ে, তার গরীবের সংসারে,
ছোটখাটো কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবারে।
ঘরের চালেতে ভুতুম ডাকিছে অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এল বুঝি হায়, হাঁকে মায়—'দূর—দূর।'
ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিয়ে তাহার সনে।

পার্শ্বে কাঁপিছে মাটির প্রদীপ, এখনি নিভিবে বুঝি,
ফুরায়ে এসেছে তৈল তাহার আঁধারের সাথে যুঝি'।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। কবিতাটিতে সন্তানের জন্য জননীর যে উৎকণ্ঠা ও বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লিখ।

২। কবিতাটিতে বাংলার পল্লীর এক করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

৩। কবিতাটিতে পল্লী-জননী কিভাবে তাঁহার সন্তানের জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) "রাত থম্ থম্ শব্দ নিঝুম ঘনঘোর আঁধিয়ার"
—কোন্ কবিতা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ? রাত্রির বর্ণনা কর।

(খ) "শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।"
—কোন্ কবিতা হইতে লাইনটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে ? 'ছেলের আয়ু' গণিবার কারণ কি ? মা কিভাবে ছেলের আয়ু ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ? ছেলেটির কি হইয়াছে ?

২। "কত কথা মনে পড়ে, তার গরীবের সংসারে।"
—কোন্ কবিতা হইতে লাইনটি উদ্ধৃত হইয়াছে ? কি কি ব্যথা কাহার মনে পড়িয়াছিল ? কি কারণে তাহা মনে পড়িয়াছিল ?

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা কর : (ক) ছোট কুঁড়ে ঘর.........ছেলের আয়ু। (খ) ফেরে ভন ভন্‌......যুঝি।

২। (ক) "পার্শ্বে কাঁপিছে মাটির প্রদীপ, এখনি নিভিবে বুঝি,
ফুরায়ে এসেছে তৈল তাহার আঁধারের সাথে যুঝি।"
—কবিতাটিতে কোন্ সময়ের কথা বলা হইয়াছে ? মাটির প্রদীপের সহিত কাহার তুলনা করা হইয়াছে ? 'আঁধারের সাথে যুঝি' বলিতে কি বুঝান হইয়াছে ? এই দুইটি লাইনের ব্যাখ্যা লিখ।

(খ) "ঘরের চালেতে ভূতুম ডাকিছে অকল্যাণ এ স্বর।"
—কোন্ কবিতার লাইন ? 'ভূতুম' কি ? লাইনটির ব্যাখ্যা কর।

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) গদ্যরূপ লিখ : ঝরিছে, গণিছে, আঁধিয়ার, হিয়া, পরাণ, যুঝি।
(খ) বাক্যরচনা কর : নিঝুম, ছোটখাট, অকল্যাণ, পরাণ, দূত, চারিধার, শীতল, আয়ু, শিয়র।
(গ) অর্থ বল : এঁদো, দরগা, শিয়র, ঘনঘোর, নয়ন-নীর, নামাজ, ভুতুম, রছুল, পীর, ঘ্রাণ, বায়না।
(ঘ) লিঙ্গ পরিবর্তন কর : দূত, বুড়ো, জননী।
(ঙ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : ঘনঘোর, চারিধার, কুঁড়েঘর, মোমবাতি, নয়ন নীর, হিয়া-কোণে, পাতা-চোঁয়া, ছোট-খাট।
(চ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : ফুরায়ে, আঁধার, নিভিবে, মরণ, গরীব, শীতল, জমাট, নিঃসাড়, আঁধিয়ার, নিঝুম।
(ছ) পদ পরিবর্তন কর : পার্শ্ব, শীতল, বায়ু, বন।

২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :
(ক) কত **কথা** মনে পড়ে। (খ) ঘরের **চালেতে** ভুতুম ডাকিছে অকল্যাণ এ সুর। (গ) ফুরায়ে এসেছে **তৈল** তাহার আঁধারের সাথে যুঝি। (ঘ) **শিয়রে** বসিয়া মনে মনে **মাতা** গণিছে ছেলের আয়ু। (ঙ) **কাঁদে** জননীর প্রাণ।

৩। পাঠ্যাংশ হইতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :
নামাজের ঘরে — মানে — মানে দান,
'ছেলেরে আমার ভাল ক'রে দাও — কাঁদে — —।
ভাল করে দাও — —, ভাল ক'রে দাও —',
কহিতে কহিতে — ভাসে বহিয়া —।

মৌখিক

১। (ক) কবিতাটির কবির নাম কি? তাঁহার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম বল। (খ) 'থম থম' কি জাতীয় শব্দ? (গ) এঁদো ডোবা হইতে কিসের ঘ্রাণ আসিতেছিল? মাতা কোথায় বসিয়া ছিলেন? (ঘ) 'নামাজ' ও 'দরগা' কোন্ জাতীয় শব্দ? শব্দগুলির অর্থ কি? 'পীর' কাহাদের বলে? তাহাদের কাজ কি? (ঙ) 'বালাই' শব্দের অর্থ কি? কখন এই শব্দ ব্যবহার হয়? (চ) 'ভুতুম' ডাকিলে অকল্যাণ হয় কেন?

২। (ক) 'মরণের দূত' কাহাকে বলা হইয়াছে? এইরূপ বলিবার কারণ কি?
(খ) 'বায়না' কথার অর্থ কি? কি কি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় বল।

৩। কবিতাটি আবৃত্তি কর।



রাঙা রাজকন্যা • জীবনানন্দ দাশ

[জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কবিদিগের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি প্রখ্যাত মহিলা কবি কুসুমকুমারী দাশের পুত্র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়াছিল। পেশায় তিনি ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। জীবনানন্দের কাব্যগুলির মধ্যে 'বনলতা সেন', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'ঝরা পালক' ও 'রূপসী বাংলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কবিতাটি 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত।]

ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ দুপুর—চিল একা নদীটির পাশে
জারুল গাছের ডালে ব'সে ব'সে চেয়ে থাকে ওপারের দিকে ;
পায়রা গিয়েছে উড়ে চবুতরে, খোপে তার ;—শশা লতাটিকে
ছেড়ে গেছে মৌমাছি; —কালো মেঘ জমিয়াছে মাঘের আকাশে,
মরা প্রজাপতিটির পাখার নরম রেণু ফেলে দিয়ে ঘাসে
পিঁপড়েরা চ'লে যায় ;—দুই দণ্ড আম গাছে শালিখে শালিখে
ঝুটোপুটি, কোলাহল—বউ কথা কও আর রাঙা বউটিকে
ডাকো নাকো—হলুদ পাখনা তার কোন্ যেন কাঁটাল পলাশে
হারায়েছে ; বউও উঠানে নাই—প'ড়ে আছে একখানা ঢেঁকি ;
ধান কে কুটিবে বল—কতদিন সে তো আর কোটে নাকো ধান,
রোদেও শুকাতে সে যে আসে নাকো চুল তার—করে নাক স্নান
এ-পুকুরে ভাঁড়ারে ধানের বীজ কলায়ে গিয়েছে তার দেখি,
তবুও সে আসে নাকো ; আজ এ দুপুরে এসে খই ভাজিবে কি ?
হে চিল, সোনালি চিল, রাঙা রাজকন্যা আর পাবে নাকি প্রাণ ?

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। কবিতাটির অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ কর।

২। কবিতাটিতে বাংলা দেশের প্রকৃতি বর্ণনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তোমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

৩। কবিতাটিতে একটি মৃত বধূর কথা বলা হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। (ক) 'ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ দুপুর'—কোন্ স্থানের দুপুরের কথা বলা হইয়াছে? দুপুরের প্রাকৃতিক বর্ণনা দাও।

(খ) 'বউ' কথা কও আর রাঙা বউটিকে ডাকে নাকো'—বউ কথা কও' কে? রাঙা বউটিকে না ডাকিবার কারণ কি? রাঙা বউটি কোথায় গিয়াছে? বউটি কি কি কাজ করিত যাহা এখন করে না, সেইসব কাজ আর না করিবার কারণ কি?

২। "রাঙা রাজকন্যা আর পাবে নাকি প্রাণ"—কোন্ রাঙা রাজকন্যার কথা বলা হইয়াছে? কবির এইরূপ চিন্তা করিবার কারণগুলি প্রকাশ কর।

ব্যাখ্যানমূলক প্রশ্ন

১। ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) কালো মেঘ জমিয়াছে ··· ··· পিঁপড়েরা চ'লে যায়।

(খ) বউও উঠানে নাই ··· ··· খই ভাজিবে কি?

(গ) হে চিল ··· ··· নাকি প্রাণ?

পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ

১। (ক) অর্থ লিখ: চবুতর, খোপ, ঝুটোপুটি, কোলাহল, কলায়ে, খই।

(খ) বাক্যরচনা কর:
নরম, রেণু, দণ্ড, কোলাহল, ঢেঁকি, ভাঁড়ার, সোনালি, প্রাণ।

(গ) গদ্যরূপ লিখ: হারায়েছে, কলায়ে, নাকো।

(ঘ) কোন্‌টি কোন পদ নির্ণয় কর: একা, দিকে, গেছে, রেণু, নরম, কোলাহল, হারায়েছে, ঢেঁকি, বীজ, রাঙা।

(ঙ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:
নরম, ওপার, মরা, কোলাহল, হারায়েছে, শুকাতে, প্রাণ, রাঙা।

২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) কালো **মেঘ** জমিয়াছে মাঘের আকাশে।

(খ) বউও **উঠানে** নাই।

(গ) আজ এ **তুপুরে** এসে খই ভাজিবে কি ?

(ঘ) ভিজে হয়ে আসে মেঘে এ **তুপুর**।

(ঙ) শশা **লতাটিকে** ছেড়ে গেছে **মৌমাছি**।

৩। (ক) সমাস নির্ণয় কর (ব্যাসবাক্যসহ)।

শশালতা, কালো মেঘ, মৌমাছি, ঝুটোপুটি, সোনালি চিল, রাজকন্যা।

(খ) পাঠ্যাংশ হইতে উপযুক্ত শব্দ চয়ন করিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

মরা — পাখার নরম — ফেলে দিয়ে ঘাসে
— চ'লে যায়, তুই — আম গাছে শালিখে শালিখে
— — — বউ কথা কও আর — বউটিকে
ডাকো নাকো — হলুদ — তার কোন্ যেন —পলাশে হারায়েছে।

মৌখিক

১। (ক) কবিতাটির কবির নাম কি ? তাঁহার কোন্ কাব্য হইতে ইহা সঙ্কলিত ?

(খ) 'চবুতর' কি ? সেখানে কাহারা থাকে ?

(গ) কবিতাটিতে কোন্ কোন্ পাখি, পতঙ্গ, গাছপালা ও সাংসারিক জিনিষের উল্লেখ আছে বল।

(ঘ) "পড়ে আছে একখানা ঢেঁকি"—কোন্ কবিতার লাইন ? ঢেঁকি কি প্রয়োজনে লাগে ? এখানে ঢেঁকির কথা বলা হইয়াছে কেন ?

(ঙ) 'কলায়ে' কথার অর্থ কি ? ভাঁড়ারে উহা 'কলায়ে' যাওয়ায় কি অসুবিধা হইয়াছে ?

২। (ক) "তবুও সে আসে নাকো'—সে বলিতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে ? না আসিবার কারণ কি ?

(খ) "হে চিল, সোনালি চিল"—চিলকে সোনালি বলিবার কারণ কি ?

(গ) 'রাঙা রাজকন্যা' বলিতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে ?

(ঘ) 'শশা লতাটিকে ছেড়ে গেছে মৌমাছি"—ছাড়িয়া যাইবার কারণ কি ?
